ব্লাডলাইন

সিডনি সেলডন

সূচিপত্র

১. একা এবং অন্ধকার 2

২. স্যামুয়েল রফের জীবনকাহিনী.....78

৩. পর্নো ফিল্মের শুটিং.....131

৪. আগুনে ঝলসে গেছে.....216

১. একা এবং অন্ধকার

প্রথম পর্ব

০১.

ইস্তানবুল। শনিবার, ৫ই সেপ্টেম্বর। রাত দশটা।

হাজিব কাফির-এর ডেস্কের পেছনে সে বসেছিল–একা এবং অন্ধকারে। অফিসের জানলায় ধুলো পড়েছে। নগরীর প্রাচীন মিনারগুলির দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। পৃথিবীর বহু দেশ সে ঘুরেছে। তবে ইস্তানবুলের মতো আর কোনো শহরকে সে ভালোবাসতে পারেনি। সাধারণত ট্যুরিস্টরা ইস্তানবুলে আসে, বেইওলগু স্ট্রিটে ঘোরাফেরা করে, হিলটন হোটেলের ঝকঝকে লালেজার বারে যায়। কিন্তু সে সেইসব জায়গায় ভ্রমণ করে যার অবস্থান কেবল মুসলমানরাই জানে। সে যায় ইয়ালিতে, স্যুকের পেছনে সেই ছোটো বাজারে। হয়তো বা ঘুরে বেড়ায় গোরস্থানে, যেখানে তেল্লিবাবার নামে সমাধিস্থল আছে, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে। যেখানে প্রার্থনা জানায়।

সে বসে আছে ধৈর্য সহকারে, ঠিক যেন একটি শিকারি, শিকারের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে আছে। তার দেহ ও মন দুটিই শান্ত। ওয়েলসে তার জন্ম হয়েছে। শ্যামলা সুন্দর চেহারা তার, ঝড়ের মতো গতিময় আচরণ। মাথা ভর্তি কালো চুল। শক্ত ও কঠিন মুখ। ঘন নীল রঙের দুটি চোখ। সেখানে তীক্ষ্ণতা ও বুদ্ধির আভাস খেলা করছে। লম্বায় সে ছ-ফুটের বেশি। সে রোগা, তবে দেহের কোথাও মাংসের অভাব ঘটেনি।

অফিসময় হাজিব কাফিরের উপস্থিতি ছড়িয়ে রয়েছে। তামাকের মিষ্টি অথচ দুর্গন্ধ বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুর্কি কফির চড়া গন্ধ, তার মোটা তৈলাক্ত শরীরের গন্ধও ভাসছে। অথচ সে অর্থাৎ রিস্ উইলিয়ামস এসব গন্ধ-টন্ধ টের পায় না।

খানিক আগে একটা টেলিফোন পেয়েছে সে শ্যামনিজ থেকে। অ্যাক্সিডেন্টের খবর।

মিঃ উইলিয়ামস, অভাবিতভাবে ঘটনাটা ঘটে গেল। আমরা আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি! মিস্টার রফের মৃত্যু ঘটেছে। নিমেষের মধ্যে দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল। বিশ্বাস করুন, আমরা ওঁকে সাহায্য করার মতো একটু ফুরসত পেলাম না।

পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহৎ ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা রফ অ্যান্ড সন্স। স্যাম রফ ছিলেন ওই সংস্থার প্রেসিডেন্ট। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি এই ব্যবসা লাভ করেছেন। পেয়েছেন বহু মিলিয়ন ডলার মূলধন। বিশ্বের নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে এই প্রতিষ্ঠানের শাখা, অফিস ও কারখানা।

রিস, বিশ্বাস করতে পারছে না যে, স্যাম রফ আর বেঁচে নেই। অথচ রফের মধ্যে প্রাণশক্তির অভাব ছিল না। বিশ্বের নানা দেশে তাকে প্লেনে চেপে যেতে হত। কোম্পানির অফিস এবং ফ্যাক্টরিগুলো ঘুরে দেখতে হত। যে-কোনো সমস্যার চটজলদি সমাধান করতে পারত সে। সে বিবাহিত। একটি সন্তান আছে তার। তবে সংসারের থেকে ব্যবসার প্রতি তার আকর্ষণ বেশী ছিল। এককথায় অসাধারণ ও বুদ্ধিমান পুরুষ ছিল স্যাম। মাত্র বাহান্ন বছরে সে পরপারের যাত্রী হল। এবার এই বিশাল সাম্রাজ্যের দায়িত্বভার কে গ্রহণ করবে?

হঠাৎ অফিসের আলো জ্বলে উঠল। রিসের চমক ভাঙল। চোখ ঝলসে গেল।

মিস্টার উইলিয়ামস, আপনি! আমি জানতাম না আপনি এখানে আছেন। সোফি, রিস্ উইলিয়ামসের সেক্রেটারি, ইস্তানবুলে এলে সোফিই তার দেখভাল করে। সোফি জাতে তুর্কি। পঁচিশ বছরের সুন্দর, স্লিম ও সেক্সি চেহারা।

সে বহুবার রিসকে তার শয্যাসঙ্গী হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। অবশ্য রিসের যদি আপত্তি না থাকে। রিস এ ব্যাপারে কোনো উৎসাহ দেখায় না।

সে বলল–সোফি, মিস্টার কাফিরের খোঁজ লাগাও। ক্যারাভান সরাই, নতুবা মারমারায় খুঁজে দেখো।

কাফিরের রক্ষিতা জনৈকা বেলি ড্যান্সার থাকে ক্যারাভান সরাইতে। রিস্ ভাবল, ওখানেই তার সন্ধান মিলতে পারে। তবে স্ত্রীর কাছে চলে যাওয়াও কাফিরের পক্ষে বিচিত্র কিছু নয়।

–আমি দেখছি।

–ও যেন এক ঘন্টার মধ্যে অফিসে এসে হাজির হয়। ওকে বলে দিও, নয়তো চাকরি থেকে কাট হতে হবে।

–ঠিক আছে, মিস্টার উইলিয়ামস।

আলো দরকার নেই। নিভিয়ে দাও।

.

অন্ধকারের মধ্যে ডুবে থেকে চিন্তা করতে ভালোবাসে রিস্। স্যাম ব্লাংকের চূড়ায় ওঠার চেষ্টা এর আগেও কয়েকবার করেছে। বছরের এই সময় ওখানে ওঠা তেমন শক্ত কাজ নয়। স্যাম নিশ্চয় পারত। যদি না তাকে ঝড়ের কবলে পড়তে হত।

স্যাম বলেছিল, মন্ট ব্ল্যাংকের মাথায় এবার কোম্পানির পতাকা পুঁতে দিয়ে আসবে। হেসে উঠেছিল সে।

একটু আগে আসা ফোনের কথা ভাবল রিস্।

অভিযাত্রীরা হিমবাহের ওপর দিয়ে উঠছিল। হঠাৎ পা ফসকে অতল খাদে পড়ে যান মিস্টার স্যাম রফ।

রিসের চোখের সামনে যেন সেই দৃশ্য জীবন্ত হয়ে ওঠে–তুষারে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে পড়ে যাচ্ছে স্যামের দেহ। গুহার দিকে নেমে যাচ্ছে। রফের শরীর তখন অতলস্পর্শী।

না, এখন মৃত স্যামের কথা ভেবে লাভ নেই। পৃথিবীর এখানে-সেখানে তার পরিবারের লোজনরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাদের কাছে খবরটা পৌঁছে দেওয়া দরকার। খবরের কাগজে সংবাদটা ছাপাতে হবে। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক চক্রগুলোতে এই খবর শকওয়েভ হয়ে দেখা দেবে। কোম্পানিতে অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই

অবস্থায় স্যামের মৃত্যুসংবাদটা যেন তাদের কাছেও ভয়ঙ্কর না হয়ে ওঠে, সেই ব্যবস্থা করতে হবে রিকে।

আজ থেকে ন বছর আগে স্যাম রফের সঙ্গে তার প্রথম আলাপ হয়। তখন রিস্ পঁচিশ বছরের যুবক। একটা ছোটো ওষুধের ফার্মে সেলস ম্যানেজারের কাজ করত। তার বুদ্ধি ও উদ্ভাবনী শক্তির বলে কোম্পানির ওষুধ বিক্রি উত্তরোত্তর বেড়ে যায়। রিসের প্রশংসা করে সকলে। ব্যাপারটা স্যাম রফের নজরেও পড়ে। সে রিকে নিজের কোম্পানিতে যোগ দেবার আহ্বান জানায়। কিন্তু রিস্ তাতে রাজি হয় না। তখন স্যাম ওই কোম্পানিটাই কিনে নেয়। ফলে রিস্ হল স্যামের কোম্পানির কর্মচারী। সেই দিনটার কথা রিস্ জীবনে ভুলতে পারবে না। আর ভুলতে পারবে না স্যাম রফের অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারাটি, যা তাকে প্রথম দর্শনে প্রভাবিত করেছিল।

স্যাম রফ বলেছিল–আমি চাই না, তুমি একটা ফালতু কোম্পানিতে কাজ করো। তাই এই কোম্পানিটা আমি কিনে নিলাম।

যদি এই চাকরি আমি না করি?

স্যাম স্মিত হেসে জবাব দিল,–না, সেটা তুমি পারবে না। কারণ তোমার-আমার মধ্যে একটা সাধারণ গুণ আছে। আমরা দুজনেই বড্ড উচ্চাশা পোষণ করি। আমরা পৃথিবীর মালিক হতে চাই। কীভাবে তা হওয়া সম্ভব, সে কৌশল তোমাকে আমি শিখিয়ে দেব।

স্যাম রফের সেদিনের সেই কথাগুলো রিস্ মোহাবিষ্টের মতো শুনেছিল। কিন্তু সেই আশু তৃপ্তির সম্ভাবনার কথা শুনে সে আত্মহারা হয়নি। নিজেকে আরও বেশি আগ্রাসী করে

তুলেছে। রফকে বলতে পারেনি, আসলে রিস্ উইলিয়ামস বলে কেউ নেই–আসলে সে হল তীব্র হতাশা এবং দারিদ্র্য থেকে সৃষ্ট একটা স্বপ্নের প্রতীক।

.

রিসের দেশ ওয়েলস লাইমস্টোন ও কয়লাখনির দেশ। রক্তাভ, ক্ষয়ে যাওয়া উপত্যকার সবুজ মাটিতেই সে জন্ম নিয়েছে। এ হল রূপকথার এক আশ্চর্য দেশ! এখানে প্রত্যেকটা জায়গার নামের সঙ্গে বিখ্যাত সব কবিতার স্মৃতি মিলেমিশে একটা কোলাজ তৈরি করেছে–ব্রেকন, পেনীয়ফ্যান, পেনডারিন, গ্লিনকরগ, মিস্টেগ। দুহাজার আটশো লক্ষ বছর আগের অরণ্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে এখানকার কয়লাখনিগুলো। তখন এই দেশের মানচিত্র এমন ছিল যে, ব্রেকন বীকনস থেকে সমুদ্রে যেতে কাঠবিড়ালিকেও মাটি স্পর্শ করতে হত না। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের যুগে সবুজের ধ্বংস শুরু হল। গাছ কেটে কাঠ সংগৃহীত হল। সেই কাঠে জ্বলবে আগুন। লৌহ ব্যবসায়ের যে লোভ তৃপ্ত হবার নয়, যে লোভর আগুন লেলিহান অনির্বাণ।

একদা ওয়েলসে ঘটেছিল সেই দুঃখজনক ঘটনা। রবার্ট ফ্যারার, যে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে ব্রহ্মচর্যের ব্রত নিতে রাজি হয়নি। তাই তাকে রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিচারে আগুনে পুড়ে মরতে হয়েছিল। দশম শতাব্দীতে আইনের শাসন এনেছিলেন রাজা হাইওয়েন দ্য গুড়। এসেছিলেন বীর যোদ্ধা ব্রাইচেন, যিনি বারোটি পুত্র ও চব্বিশটি কন্যার পিতা হয়েছিলেন। যিনি তার শত্রুদের সঙ্গে জবরদস্ত মোকাবিলা করেছিলেন।

এসব আজ ইতিহাস হয়ে গেছে। সবই অতীত। কিন্তু বর্তমানের বেদনার জ্বালা অসহনীয়।রিসের বাপ-ঠাকুরদা বংশপরম্পরায় কয়লাখনির শ্রমিক। মাঝে মাঝে কয়লাখনির মালিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। খনিগুলোর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। শ্রমিকরা দরিদ্রতার শিকার হয়। খাবার জোটে না। তাদের মানবিক অহংকার ও শক্তি বিধ্বস্ত হয়। তারা আত্মসমর্পণ করে। তাদের মৃত্যু ঘটে। কেউ বা কয়লাখনির অন্ধকারে মরে পড়ে থাকে। কেউ বা দিনের পর দিন ফুসফুঁসের অসুখে ভোগে। কাশতে কাশতে একদিন তার মরণ। ঘনিয়ে আসে। বেশির ভাগ কয়লাখনি শ্রমিক তিরিশ বছর আয়ু নিয়ে পৃথিবীতে আসে।

রিস্ শুনেছে খনিশ্রমিকদের দিনপাতের কাহিনী। শুনেছে ধর্মঘটের গল্প। শুনেছে খনি ধ্বসে পড়ে কত শত শ্রমিকের মৃত্যু ঘটেছে। রিস্ কয়লাখনির শ্রমিক হতে চায়নি। তাই সে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল। তখন সে মাত্র বারো বছরের এক কিশোর।

সে চলে এসেছিল সমুদ্র উপকূলে। সেখানে অনেক ট্যুরিস্টদের আসা-যাওয়া ছিল। রিস তাদের কাজ করে দিত। ফাইফরমাস খাটত, মাল ঘাড়ে করে নিয়ে যেত। উঁচু পাহাড় থেকে ধনী মহিলাদের হাত ধরে নামিয়ে দিত। ধনী রমণীদের দেখে তার মনে হত রানি। স্মার্ট ও সুন্দর চেহারার পুরুষদের দেখে তার ইচ্ছা জাগত, ওদের মতো হতে।

দু বছর বাদে রিস্ এল লন্ডনে। পশমি কাপড়ের দোকানে কাজ জুটিয়ে নিল। মাল ডেলিভারি করার কাজ। তার অদ্ভুত ও খাপছাড়া পেপাশাক এবং অপরিশীলিত কথাবার্তা শুনে দোকানের কর্মচারীরা তাকে নিয়ে ঠাট্টা করত।

তাদের মধ্যে গ্লাডিস বিমসন নামে একটি মেয়েও ছিল। সে-ও ওই দোকানে কাজ করত।

একদিন গ্লাডিস তাকে তার বাড়িতে চা খাওয়ায় নিমন্ত্রণ জানাল।

জীবনে প্রথম যৌন মিলনের অভিজ্ঞতা লাভের আশায় রিস্ তার গলা জড়িয়ে ধরতে গিয়ে বাধা পেল।

মেয়েটি বলল–থামো-থামো! আগে জীবনে বড়ো হও, দেখবে সব পাবে। পড়াশোনা করে, ভালো পোশাক পরতে শেখো। ভদ্রসমাজে মিশতে শেখো। তবেই তো জীবনে বড়ো হওয়া যায়।

.

শুরু হল রিসের বড়ো হওয়ার সাধনা। সেদিনের সেই অশিক্ষিত, দরিদ্র, অত্যন্ত সাধারণ ঘরের ছেলেটা কল্পনা শক্তি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর দুরন্ত উচ্চাশাকে পায়ে করে নতুন এক রিকে জন্ম দিতে স্থির সংকল্প হয়ে উঠল। নিজেকে উদ্বুদ্ধ করতে সে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াত। একটু একটু করে রিস্ পাল্টে গেল। রোজ রাতে সে স্কুলে যেত। ছুটির দিনে ছবির গ্যালারিতে মাঝে মধ্যে লাইব্রেরি আর থিয়েটার হলে। রোজের খাবারের পয়সা বাঁচিয়ে সে সপ্তাহে একদিন নামিদামি হোটেলে গিয়ে ঢুকত। সুসভ্য মানুষেরা কীভাবে টেবিলে বসে খায়, তা লক্ষ্য করত।

এক বছরের মধ্যেই রিস্ অনেক কিছু শিখে নিল। বুঝতে পারল, গ্লাডিস তাকে ঠিক রাস্তাই দেখিয়েছিল, সেই লন্ডনের সেই অনভিজাত এলাকার সস্তা মেয়েটা!

সে ড্রেসারের দোকানের চাকরিটা ছেড়ে দিল। এল কেমিস্টের দোকানে। তখন তার বয়স মাত্র ষোলো। কিন্তু বয়সের তুলনায় চেহারাটা তার বরাবরই ভারী। আগের চেয়ে লম্বাতেও বেড়েছে। শ্যামলা সুন্দর চেহারার অধিকারী রিস, মেয়েদের সঙ্গে তোষামোদ করে কথা বলার ভঙ্গিটি শিখেছিল খুব যত্ন করে। তাই তার কাউন্টারেই মেয়েদের ভিড় উপচে পড়ত। দু-বছর যেতে না যেতেই রিসের পদোন্নতি হল। সে হল ম্যানেজার। এইভাবে উন্নত জীবনের লক্ষ্যে কিছুটা পথ পেরিয়ে এসেছে সে। তাকে আরও–আরও বড় হতে হবে।

একদিন এক ওষুধের কোম্পানির সেলসম্যান তার দোকানে ঢুকল। তখন রিসের কাউন্টারে মহিলাদের ভিড়। লোকটি দেখল মহিলাদের মধ্যে কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রির জন্য রিস্ কথার জাল সৃষ্টি করে চলেছে।

লোকটি বলল–তুমি এখানে বাজে সময় খরচ করছ। আমার বসকে তোমার কথা জানাব।

এর পনেরো দিন পরে রিস্ ওষুধের কোম্পানিতে সেলসম্যানের চাকরি পেল। সেখানে সে ছাড়া আরও পঞ্চাশ জন সেলসম্যান আছে। কিন্তু কেউ তার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। সে নিজেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী। এখনও সে আয়নায় দেখে, মনে মনে যা কিছু সে কল্পনা করেছে, বাস্তবে তার কতটা ঘটেছে। সে এখন বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, ভদ্র ও আকর্ষণীয়

পুরুষে পরিণত হয়েছে। ||||||||| দেশে দেশে ঘুরেছে সে। ওষুধ বিক্রি করেছে। সে কথা শুনেছে। কথা বলেছে। তারপর লন্ডনে ফিরে গেছে। কোম্পানিকে নানা বাস্তবসম্মত ব্যবসার কৌশল বলে দিয়েছে। এতদিনে কোম্পানির পাশাপাশি রিও সাফল্যের চূড়ায় উঠতে শুরু করেছে।

কেটে গেছে আরও তিনটি বছর। রিস্ জেনারেল সেলসম্যানেজারের পদে উন্নীত হল। তার চতুর পরিচালনায় কোম্পানির বিক্রি কয়েক গুণ বেড় গেল।

এর ঠিক চার বছর পর স্যাম রফের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল।

–আমাদের দুজনের মধ্যে একটা সাধারণ মিল আছে। স্যাম বলেছিল, পৃথিবীকে আমরা হাতের মুঠোয় নিতে চাই। কেমনভাবে তা সম্ভব, তোমাকে আমি শিখিয়ে দেব।

স্যাম তার কথার খেলাপ করেনি।

স্যামের সুচতুর পরিচালনায় ন-বছরের মধ্যে রিস্ উইলিয়ামস কোম্পানির অবিচ্ছেদ্য ও বহুমূল্য অংশ হয়ে উঠল। এখন তার ওপর কোম্পানি ভরসা করতে পারে। তার দায়িত্বের সীমানা বেড়ে গেছে। এসব কিছু একদিনে হয়নি। ক্রমশ তাকে বেশি দায়িত্বের কাজ দেওয়া হয়েছে। প্রথমে রফ অ্যান্ড সন্সের বিভিন্ন শাখার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার গুরুভার তার ওপর ন্যস্ত হল। নতুন ভাবে শাখা গড়ে তোলার জন্য রিসূকে সেই স্থানে পাঠানো হত। কোনো শাখায় ঝামেলা দেখা দিলে রিসকে পাঠানো হত সমাধানের জন্য। এমনকি কোম্পানি কী ভাবে চালাতে হয়, তাও স্যাম রফ তাকে শিখিয়ে দিয়েছিল, যা স্যাম রফকে বাদ দিলে সে ছাড়া আর কেউ জানে না।

একদিন সকালে কোম্পানির বোয়িং বিমানে চড়ে তারা ক্যারাকাস থেকে ফিরছিল। সেবার ভেনেজুয়েলা সরকারের লাভজনক একটা টেন্ডারের ব্যাপারে রিস্ অভাবনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

স্যাম তার কাজের প্রশংসা করে বলেছিল–তুমি মোটা অঙ্কের একটা বোনাস পাবে।

রিস বলেছিল–বোনাস আমার প্রয়োজন নেই স্যাম। আমি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরস-এর একজন হতে চাই। কোম্পানির কিছু শেয়ার পেতে চাই।

–দুঃখিত রিস্। তুমি তো জানো, রফ পরিবারের বাইরের কেউ এই সংস্থার ডিরেক্টর পদে আসতে পারে না, এটা নিয়ম বহির্ভূত। এমনকি বাইরের কেউ শেয়ার হোল্ডারও হতে পারে না। আমি তোমার কথা রাখতে পারছি না।

রিস্ জানে, রফ অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট কোম্পানি রফ পরিবারের বাইরের লোককে বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত করে না। আজ পর্যন্ত সেই বাইরের লোক হিসেবে অর্থাৎ ব্লাডলাইন অতিক্রম করে বোর্ড মিটিং-এ উপস্থিত থেকেছে।

এই কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে শেষ পুরুষ হিসেবে স্যামই ছিল। এছাড়া সবাই মহিলা-স্যামের মেয়ে, আর মাসতুতো, খুড়তুতো, মামাতো বোনেরা। তাদের স্বামীরাই এখন ডিরেক্টর পদগুলো অলংকৃত করে আছে। একমাত্র অ্যালেক বাদে।

ওয়ালথার গ্যাসনার, যে অ্যানা রফকে বিয়ে করেছে।

সিমনেস্তা রফের স্বামী ইভো পালাজজি। হেলেন রফ বিয়ে করেছে শার্ল মারতেইলেকে।

আর স্যার অ্যালেক নিকলস, যার মা রফ পরিবারের মেয়ে।

রিস্ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছে। এ গুণটা সে স্যামের কাছ থেকেই পেয়েছে। সে জানে, একদিন পরিস্থিতি পাল্টে যাবে। কিন্তু তার আগেই স্যাম মারা গেল।

.

ইতিমধ্যে অফিস আবার আলোকিত হয়ে উঠেছে।

হাজিব কাফির দরজার গোড়ায় এসে পা রেখেছে। কোম্পানির তুরস্ক শাখার সেলসম্যানেজার সে। বেটে ও মোটা চেহারা, আঙুলে হীরের আংটি। তার পোশাক অবিন্যস্ত। খুব সম্ভবত স্যামের আকস্মিক মৃত্যুর খবর পেয়ে খুব তাড়াতাড়িতে পোশাক পরেছে সে। হয়তো বা যৌন মিলন অসমাপ্ত রেখে উঠে এসেছে।

–এসো হাজিব। চারটি দেশে কেবল পাঠাতে হবে। কোম্পানির সাংকেতিক কোডে কেবল যাবে আর সেগুলো কোম্পানির পত্রবাহকেরা হাতে হাতে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

মণিবন্ধে বাঁধা সোনার তৈরি ব্যম অ্যান্ড মারসিয়ার রিস্টওয়াচে চোখ বুলিয়ে নিয়ে রিস্ বলল–ন্যু সিটি পোস্ট অফিস এখন খোলা নেই। ইয়েনি পোস্টানে ক্যাড থেকে কেবল পাঠাও। এই নাও কেবলের কপিটা। আধঘন্টার মধ্যে যেন সব পৌঁছে যায়। আর এ ব্যাপারে কেউ বেশি কথা বাড়ালে চাকরি থেকে তাকে খারিজ করে দেওয়া হবে।

–মাই গড! কেবলটা পড়ে হাজিব রিসের দিকে তাকাল, কীভাবে হল?

দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনায় স্যাম রফের প্রাণ গেছে।

এই মুহূর্তে রিসের চেতনায় দেখা গেল এলিজাবেথ রফকে। এতক্ষণ রিস্ এদিকের ঝামেলায় তার কথা ভুলেই গিয়েছিল। এলিজাবেথ রফকে সে যখন প্রথম দেখেছিল, তখন সে পনেরো বছরের এক কিশোরী। দাঁত উঁচু বলে ব্রেস লাগিয়ে ঘুরছে। সে এখন বড়ো হয়ে আরও সুন্দরী হয়েছে। মায়ের সৌন্দর্য আর বাবার বুদ্ধিমত্তা, দুটোই সে লাভ করেছে। সে লাজুক, মোটা, নিঃসঙ্গ ও বিদ্রোহিণী। রিসের সঙ্গে তার মধুর সম্পর্ক। বাবার মৃত্যুসংবাদে মেয়েটা খুব ভেঙে পড়বে। রিস্ ঠিক করল, সে নিজেই এই দুঃসংবাদটা তাকে দেবে।

ঘন্টা দুই পরে রিস্ অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল। তাকে নিয়ে কোম্পানির জেট বিমান তখন উড়ে চলেছে নিউ ইয়র্কের দিকে।

.

০২.

বার্লিন। সোমবার, ৭ই সেপ্টেম্বর, বেলা দশটা।

শোবার ঘরের এক কোণে ঘাপটি মেরে বসে আছে অ্যানা রফ গ্যাসনার। সে ভয়ে কুঁকড়ে আছে। সে জানে, আর্তচিৎকার করলেই স্বামী ওয়ালথারের হাতে তাকে মরতে

হবে। তার সর্বাঙ্গ ভয়ে কাঁপছে। অথচ সুন্দর এক রূপকথার মতো তাদের প্রেম শুরু হয়েছিল। এখন সেই প্রেমের এমন আতঙ্কিত পরিসমাপ্তি তাকে কঠিন সত্যের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে–সে উন্মাদ, খুনিকে বিয়ে করেছে।

.

ওয়ালথার গ্যাসনার–অ্যানার প্রথম ও শেষ প্রেম। অ্যানা কাউকে কোনোদিন ভালোবাসেনি। এমনকি নিজের ওপরেও তার ছিল তীব্র বিতৃষ্ণা। ছোটো থেকেই অসুখে ভুগত। রোগা চেহারা। মাঝে মাঝে জ্ঞান হারাত। তাই তার বেশির ভাগ সময় কেটে গেছে হাসপাতালে, নার্স এবং ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে। তার বাবা আন্তন রফ ছিলেন রফ অ্যান্ড সন্সের অন্যতম অংশীদার। তাই মেয়ের চিকিৎসার জন্য দূরদেশ থেকে প্লেনে করে মেডিক্যাল স্পেশ্যালিস্টরা এসে অ্যানাকে দেখত, ওষুধ দিত, চলে যেত। কিন্তু কেউ অ্যানার অসুখ সারাতে পারেনি।

অ্যানা তাই স্কুলে যেতে পারেনি। সে সর্বদা আপন মনে স্বপ্নের মধ্যে বিচরণ করত। তার ফ্যান্টাসির জগতে অন্য কারো প্রবেশের অধিকার ছিল না। বাস্তবের চড়া রং তার পছন্দ নয়। কল্পনার রঙে সে নিজের জীবনের ছবি আঁকত।

আঠারো বছর বয়েসে পা দিল অ্যানা। হঠাৎ একদিন সে সুস্থ হয়ে উঠল। তার ফিটের অসুখ সেরে গেল। পঁচিশ বছর বয়স থেকে তার বিয়ের প্রস্তাব আশা শুরু হল। উত্তরাধিকার সূত্রে অ্যানা পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত আন্তর্জাতিক ব্যবসা সংস্থার অন্যতম মালিক হবে। তাই পাত্রদের ভিড় লেগে গেল। এল সুইডেনের এক কাউন্ট, ইতালির

এক কবি। আফ্রো এশিয়ান দেশগুলোর প্রায় সাত জন রাজপুত্র তার পাণিপ্রার্থী হল। কিন্তু অ্যানা রাজি হল না। এতে আন্তন রফ মনে মনে দুঃখ পেল। মেয়ের তিরিশতম জন্মদিনে আন্তন বলল নাতির মুখ দেখা বোধহয় আমার ভাগ্যে নেই।

অ্যানা পঁয়ত্রিশ বছরে পা রেখে অস্ট্রিয়ায় বেড়াতে গেল। বরফের ওপর স্কি খেলতে লাগল। দেখা হল ওয়ালথারের সঙ্গে। ওয়ালথার গ্যাসনার। সে স্কি খেলায় এক্সপার্ট। প্রথম দেখা হওয়ার মুহূর্তটাতে বরফে ঢাকা পাহাড়ি উতরাই বেয়ে সে নেমে আসছিল। অ্যানা তার থেকে তেরো বছরের বড়ো।

ওদের কথা হল। ওয়ালথার বলল–তুমি স্কি খেলো না! চল আজ আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ করব।

অ্যানা ভয় পেয়েছ। স্কুলের মেয়ের মতো লাজুক ভঙ্গিতে সে সেখান থেকে চলে যায়। কিন্তু ওয়ালথার তার পেছু ছাড়েনি।

অ্যানা সুন্দরী নয়, অ্যানার বুদ্ধি কম, তবে সে বোকা নয়। সে জানে, তার এমন কোনো সম্পদ নেই যার লোভে পুরুষ তার চারপাশে ঘুরঘুর করবে। তবে হ্যাঁ, তার নামের গুরুত্ব আছে। অ্যানার মধ্যে একটা সংবেদনশীল মন আছে, যেখানে সযত্নে রক্ষিত আছে প্রেম, গান, কবিতা। সেই মনের অস্তিত্বের কথা বাইরের কেউ জানে না।

অ্যানা নিজে সুন্দরী নয় বটে, কিন্তু সে সুন্দরের পুজো করতে জানে। সৌন্দর্যকে শ্রদ্ধা করে, মিউজিয়ামে যায়। অপলক চোখে বিখ্যাত পেইন্টিং ও স্ট্যাচুগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। ওয়ালথার গ্যাসনারকে সে মনে মনে ভালোবেসে ফেলেছে। এত সুন্দর তার

মুখের অবয়ব, যেন স্বর্গ থেকে কোনো দেবদূত নেমে এসেছে পৃথিবীতে! তার সুন্দর সাজানো দাঁত, রোদে পোড়া তামাটে গায়ের রং, মাথা ভর্তি সোনালি চুল, শ্লেট-ধূসর চোখের মণি, স্কি খেলার পোশাকের নীচে বাইসেপস ও উরুর মাংসপেশির স্বচ্ছন্দ গতি দেখে আনার গোপন অঙ্গ থিরথিরিয়ে ওঠে। অ্যানা অনেকবার চেষ্টা করেছে স্কি খেলার, কিন্তু পারেনি। তুষারের ওপর আছড়ে পড়েছে। ওয়ালথার তাকে তুলে ধরেছে।

এইভাবে পাঁচদিন কেটে গেছে। একদিন ওয়ালথার তার হাতে হাত রেখে বলেছে–অ্যানা, আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই।

স্বপ্নের রূপকথার জগৎ থেকে অ্যানা বুঝি বাস্তবে ফিরে এল। সে সুন্দরী নয়। পঁয়ত্রিশ বছরের কুমারী যুবতী। তার দিকে এগিয়ে আসে সেইসব পুরুষেরা, যারা বড়োলোক হতে চায়।

অ্যানা ওয়ালথারকে এড়িয়ে যেতে গিয়ে বাধা পড়ল। ওয়ালথার তার হাত চেপে ধরে বলল–তোমাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি অ্যানা। তুমিই আমার প্রথম ভালোবাসা!

ওয়ালথার বলতে থাকে তার জীবনের গল্পকথা। সে এক জারজ সন্তান। অনাথ আশ্রমে তার শৈশব কেটেছে। তেরো বছর বয়েস থেকে অরফানেজের মেয়েরা তাকে নিজেদের ঘরে নিয়ে যেত। তাকে কাজে লাগাত। আনন্দ দিতে শেখাতো। বিনিময়ে সে পেত কেক বা মাংসের টুকরো। ভালোবাসা পায়নি। বড়ো হয়ে কিন্তু সে অনাথালয় থেকে চলে এসেছে। তার সুন্দর চেহারা দেখে মেয়েরা মুগ্ধ হয়েছে। তাকে ডেকেছে, তার সঙ্গ

নিয়েছে। তার সঙ্গে যৌন মিলন ঘটিয়েছে। সে হাত ভরে পেয়েছে জুয়েলারি দ্রব্য, পোশাক–আরো কতরকমের উপহার! কিন্তু প্রেম? প্রেম তারা তাকে দিতে পারেনি।

অ্যানা ওয়ালথারের রূপকথা শুনেছিল, বিশ্বাসও করেছিল।

তার মনে হল, ওয়ালথার বুঝি তার হৃদয়ের সম্রাট।

শেষ পর্যন্ত টাউনহলে ছোট্ট একটি পার্টি দেওয়া হল। ওদের বিয়ে হল।

.

বাড়িটা আমার ভালো লেগেছে।

দেওয়ালের পুরোনো পেইন্টিংগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে ওয়ালথার বলেছে।

-হ্যাঁ, অনাথ আশ্রম থেকে ভালো। আন্তন রফ বলেছে।

–কিছু বলছেন?

–তুমি ভুল করেছ। আমার মেয়ের অর্থ নেই। রফ অ্যান্ড সন্সের শেয়ারহোল্ডার হলে কী হবে, তা বিক্রি করা যায় না। আমরা স্বচ্ছন্দে থাকি। এছাড়া আর কিছু নয়। তোমাকে কুড়ি হাজার মার্ক দিতে পারি। এটা নিয়ে বার্লিন ছেড়ে চলে যাও। কাল সকাল ছটার পর তোমাকে যেন আর না দেখি। কথা দাও, অ্যানার সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ রাখবে না।

–আপনি সম্ভবত ভুল বলছেন। অ্যানাকে আমি সত্যি সত্যি ভালোবেসেছি।

না, কথাটা তুমি ঠিক বলছ না।

.

সেদিন সন্ধ্যায় আন্তন রফ বাড়ি ফিরতেই অ্যানা ছুটে এল। তার চোখে জল।

আন্তন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল–শান্ত হও অ্যানা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

আন্তন দরজার দিকে তাকাল–ওয়ালথার দাঁড়িয়ে আছে।

–ওয়ালথার আমাকে কী সুন্দর আংটি দিয়েছে দেখো বাবা! অ্যানা বলতে থাকে এটার দাম কুড়ি হাজার মার্ক!

.

এরপরে আন্তন আর অরাজী থাকতে পারল না। তারা ওয়ালথারকে জামাই হিসেবে মেনে নিল। নবদম্পতির ঘরদোর সাজিয়ে দিল ফরাসি আসবাবপত্রে, কৌচে, ইজিচেয়ারে। বিয়ের যৌতুক হিসেবে দেওয়া হল ডেনমার্ক ও সুইডেনের অষ্টাদশ শতাব্দীর স্থাপত্যের * নিদর্শন সমেত সুন্দর একটা বাড়ি।

–অ্যানা, আমি তোমার কাছ থেকে কোনো উপহার নিতে চাই না। কিন্তু আমি চাই, তোমাকে সুন্দর সুন্দর উপহার দিতে। কিন্তু অ্যানা, আমার তো অত টাকা নেই।

ওয়ালথার, কেন মন খারাপ করছ? আমার যা কিছু, সবই তো তোমার। আমার ট্রাস্ট ফান্ডে যা টাকা আছে, তাতে আমাদের দিব্যি সুখে কেটে যাবে। কিন্তু ডিরেক্টররা সম্মতি দিলে তবেই আমি শেয়ার বিক্রি করতে পারি, নতুবা নয়।

–ওগুলোর দাম কত?

ওয়ালথারের প্রশ্নে অ্যানা সেই অবিশ্বাস্য অঙ্কটা বলল, একবার নয়–দুবার।

–কিন্তু বিক্রি করা যাবে না কেন?

–না, মানে, আমার দূর সম্পর্কের ভাই স্যাম এই ধরনের নিয়ম জারি রেখেছে। হয়তো একদিন...

ওয়ালথার রফ অ্যান্ড সন্স-এ যোগ দিতে চাইল। আন্তন রাজি হল না।

-তুমি স্কি খেলার এক্সপার্ট, ব্যবসার কী বুঝবে?

কিন্তু মেয়ে অ্যানা নাছোড়বান্দা। শেষপর্যন্ত কোম্পানির অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে একটা পদ ওয়ালথারকে দেওয়া হল। সে খুব দ্রুত উন্নতি করতে থাকল। কেটে গেল দশটি বছর। আন্তনের মৃত্যু হল। ওয়ালথার হল বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্ এর এক জন। স্বামীর কাজকর্মে অ্যানা খুব খুশি। ওকে নিয়ে গর্ববোধ করে সে। স্বামী ও প্রেমিক হিসেবে

ওয়ালথার আদর্শ। অ্যানার জন্য সে প্রায়সই ফুল আনে। ছোটো ছোটো উপহার আনে। সন্ধ্যেটা তারা বাড়িতেই কাটায়।

অ্যানার জীবনে সুখ উপচে পড়েছে। সুখ তার প্রতিটি অঙ্গকে সিক্ত করছে। ওয়ালথারের পছন্দ মতো রান্না করে সে।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাঁধুনি তুমি! ওয়ালথার প্রশংসা করে।

অ্যানা লজ্জায় আর অহংকারে রক্তিম হয়ে ওঠে।

বিয়ের পর দু-বছর কেটে গেল। অ্যানা গর্ভবতী হল। তার মনে তখন অদ্ভুত শিহরণ।

দেখতে দেখতে আট মাস কেটে গেছে। ভাবী সন্তানের মুখ চেয়ে অনেক কষ্ট সহ্য করেছে সে। ইতিমধ্যে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল।

একদিন দুপুরবেলা, লাঞ্চের পর অ্যানা সোয়েটার বুনছে–ওয়ালথারের জন্য। বুনছিল, ভাবছিল, দিবাস্বপ্ন দেখছিল।

কখন যে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে গেছে তার খেয়াল নেই। ওয়ালথারের গলার স্বরে তার চমক ভাঙে। সোয়েটার একটুও বোনা হয়নি।

মাঝে মাঝেই অ্যানা ভাবনার জগতে চলে যেত। সে ভাবল, এসব আসন্ন মৃত্যুর অশুভ ইঙ্গিত। মৃত্যুকে সে ভয় পায় না। কিন্তু ওয়ালথারকে ছেড়ে যাওয়া...

অ্যানার বাচ্চা হতে আর মাত্র এক মাস বাকি। একদিন দিবাস্বপ্ন দেখতে দেখতে সিঁড়ি থেকে পড়ে গেল অ্যানা।

জ্ঞান ফিরল যখন, তখন সে হাসপাতালে।

ওয়ালথার তার হাত চেপে ধরেছে–তুমি যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল অ্যানা!

–আমার বাচ্চা?

ডাক্তার বলল–যমজ, মিসেস গ্যাসনার।

–একটা ছেলে, একটা মেয়ে, ওয়ালথার বলল।

অ্যানা তখন সুখসাগরে ভাসছে–ওঃ, কবে যে ওদের দেখব, কোলে নেব, আদর করব!

ডাক্তার বলল–আপনি আগে সুস্থ হয়ে উঠুন।

.

হাসপাতাল থেকে ফিরে অ্যানা বাচ্চাদের খোঁজ করল।

–আমি বাচ্চাদের কাছে যাব।

না, ডার্লিং, তুমি এখনও অসুস্থ।

অ্যানা নার্সারির দিকে ছুটে গেল। জানালা বন্ধ। ওয়ালথার তাকে কী যেন বোঝানোর চেষ্টা করল।

অ্যানা দেখল, দোলনায় দুটি শিশু শুয়ে আছে। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। ছেলেটির মাথায় সোনালি চুল, ঠিক যেন ছোট্ট ওয়ালথার। আর মেয়েটি? সুন্দর সোনালি নরম চুলের একটা পুতুল বুঝি!

কত সুন্দর আমার বাচ্চারা! আমার সুখের অন্ত নেই!

চলো অ্যানা। ওয়ালথার অ্যানাকে জড়িয়ে ধরে এগিয়ে যায়। তার আলিঙ্গনে শরীরে কামনার ছোঁয়া। অ্যানা ভাবে, ওয়ালথার ঠিকই বলেছে, বাচ্চাদের দেখার অনেক সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু এই মুহূর্ত আর ফিরে আসবে না। কতদিন তারা শরীরে শরীর মেলায়নি। সেই মুহূর্তে অ্যানা আর কিছু ভাবতে পারে না।

ছেলের নাম দেওয়া হল পিটার আর মেয়ে বারজিত্তা। অ্যানা সারাক্ষণ কাটিয়ে দেয় বাচ্চাদের সঙ্গে। তাদের অপরূপ সৃষ্টির দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। ওদের সাথে কথা বলে, খেলা করে। বাচ্চারা কথা বলতে পারে না। কিন্তু মায়ের ভালোবাসা ওরা ঠিক বুঝতে পারে। এইভাবে সারাদিন কেটে যায়। ওয়ালথার ফিরে এলে সে বলে–এসো, আমাদের সঙ্গে খেলবে এসো।

ওয়ালথার কথা ঘোরায়।

রান্নাবান্না করেছ? খাবার তৈরি?

ইস্, রান্না করার কথা অ্যানা ভুলেই গেছে! নিজেকে অপরাধী মনে হয় তার। না, গ্যাসনারের দিকে ওর নজর দেওয়া উচিত। বাচ্চাদের নিয়ে এত বেশি মাতামাতি আর সে করবে না।

কিন্তু পরের দিনও একই রকম। ওয়ালথার মাঝরাতে নার্সারিতে গিয়ে ঢোকে।

-তুমি এখানে কী করছ অ্যানা?

–কিছু নয়।

যাও, নিজের বিছানায় চলে যাও।

ওয়ালথারের কঠিন কণ্ঠস্বর এই প্রথম শুনল অ্যানা।

সকাল হল।

ওয়ালথার বলল–আমরা ছুটিতে বেড়াতে যাব।

–এত ছোটো বাচ্চাদের নিয়ে...

–ওরা নয়, শুধু তুমি আর আমি।

ওদের ফেলে রেখে আমি কোথাও যাব না।

–অ্যানা, ওদের কথা তোমায় ভুলতে হবে।

–কেন?

–তুমি আমাদের সেই যুগলবন্দি দিনগুলির কথা মনে করো। কী সুন্দর আমরা দুজন

ও, ওয়ালথার বাচ্চাদের হিংসে করে, অ্যানা ভাবে।

.

বছর কেটে গেল। ওয়ালথার কখনোই বাচ্চাদের কাছে যায় না। ওদের জন্মদিনে ওয়ালথার কাজের অজুহাতে বাইরে কাটায়। অবশ্য অ্যানা ওদের নানারকম উপহার কিনে দেয়। বাচ্চাদের প্রতি অ্যানার টান বেশি, তাই বোধহয় ওয়ালথার তাদের এড়িয়ে চলে।

ওয়ালথার ডাক্তার ডাকে। অ্যানা নাকি অবসাদে ভুগছে। অ্যানা দিবাস্বপ্নে বিভোর থাকে। ডাক্তার পরে আসবে বলে বিদায় নেয়।

ওয়ালথার বাচ্চাদের সম্পর্কে কোনো কথা শুনতে চায় না। অ্যানা বলেও না।

ইতিমধ্যে তিন বছর কেটে গেছে। পিটার ঠিক তার বাবার মতো দেখতে হয়েছে। অ্যাথলিটের মতো পেটানো চেহারা। রাগী, মাঝে মধ্যে সেজন্য মার খায়। বড়ো হলে মেয়েরা ওর চীনে মাটির মতো শরীরের ওপর হামলে পড়বে। আর বারজিত্তাও ভারি সুন্দর দেখতে হয়েছে!

ওয়ালথারের অনুপস্থিতিতে অ্যানা বচ্চাদের সঙ্গে খেলা করে, গান শোনায়, গল্প বলে। ঘুমপাড়ানি সুর তোলে।

ওয়ালথার বাচ্চাদের দুচোখে দেখতে পারে না। বাবা ঠিকই বলেছিল, ও টাকার লোভে তাকে বিয়ে করেছে। ওয়ালথার ওই পথের কাঁটা দুটোকে সরাতে চাইছে, কিন্তু কীভাবে?

–অ্যানা, ওয়ালথার বলল, স্যামের নিয়ম আমরা মানব না। শেয়ার বিক্রি করে ওই টাকা নিয়ে আমরা অন্য কোথাও চলে যাব।

–আর ছেলেমেয়েরা?

ওদের সরিয়ে দেব। আমাদের দুজনের মাঝখানে ওরা কখনোই থাকবে না।

ওয়ালথার নিশ্চয়ই পাগল। অ্যানা ভয়ে আঁতকে ওঠে। বাড়িতে কোনো কাজের লোক রাখেনি ওয়ালথার। সপ্তাহে একদিন একটা ঝাড়ুদারনি আসে। অ্যানা ভাবে, ওয়ালথারের মাথার চিকিৎসা করা দরকার। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পাগলদের শিপ অফ ফুলস নামে হাউসবোটে বন্দি করে রাখা হত। আধুনিক চিকিৎসা উন্নত। ওয়ালথার নিশ্চয়ই সুস্থ হবে।

.

এবং আজ-৭ই সেপ্টেম্বর। অ্যানা ঘাপটি মেরে বসে আছে। ওয়ালথার নেই। দরজা বন্ধ বাইরে থেকে। এবং অ্যানা একটা সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। তাকে নিজেকে বাঁচাতে হবে। বাচ্চাদের বাঁচাতে হবে।

রিসিভার তুলে নিল অ্যানা। ডায়াল করল, পুলিশ এমারজেন্সি নম্বর ১১০।

-হ্যালো, পুলিশ স্টেশন। বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি?

–হ্যাঁ, মানে... ।

হঠাৎ ওপর থেকে একটা হাত ঝপ করে নেমে এল। রিসিভার কেড়ে নিল।

–ওয়ালথার, দয়া করে আমাকে মেরো না।

ওয়ালথারের চোখ দুটো জ্বলছে, কিন্তু নরম কণ্ঠ–ডার্লিং, আমি তোমায় ভালোবাসি। তোমাকে মারতে আমি চাই না। আবার পুলিশ আসুক আমি তাও চাই না। আসলে বাচ্চারাই ঝামেলা পাকাচ্ছে। ওদের আমি বাঁচিয়ে রাখব না।

হঠাৎ কলিং বেলের আওয়াজ শোনা যায়।

ওয়ালথার বেরিয়ে গেল। আবার বাইরে থেকে তালা দিল। অ্যানা বেডরুমের ভেতরে পাথরের মতো বসে থাকে।

পিওন একটা খাম এগিয়ে দিল–মিস্টার ও মিসেস গ্যাসনারের জন্য।

–দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, পাহাড়ে উঠতে গিয়ে পা ফসকে পড়ে গিয়ে স্যাম রফ মারা গেছে। জুরিখে আগামী বোর্ড অফ ডাইরেক্টরসূদের মিটিং-এ উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি।রিস্ উইলিয়ামস।

.

০৩.

রোম। ৭ই সেপ্টেম্বর, সোমবার, সন্ধ্যা ৬ টা।

ইভো পালাজজি। বেডরুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। মুখ থেকে রক্ত ঝরছে। সে চিৎকার করছে।

–আমার এ কি সর্বনাশ হল!

–এখনই সর্বনাশের কী দেখলে? দোনাতেল্লার চিৎকার।

ভায়া মঁতেমিগ্যাঁও-র ফ্ল্যাট। মস্ত বড়ো বেডরুম। নারী-পুরুষ দুজনেই উলঙ্গ।

দোনাতেল্লা সেক্সি, কামনা জাগানো রমণী, ইভো পালাজজি এমন শরীর আগে কখনও দেখেনি।

যদিও দোনাতেল্লা তাকে এইমাত্র আঁচড়ে কামড়ে দিয়েছে, তবু এখনও নিজের পুরুষাঙ্গে কামনার পরিচিত জাগরণ ইভো যেন টের পাচ্ছে।

যুবতী নিঃসন্দেহে সুন্দরী, দোনাতেল্লার নগ্ন শরীর ইভোর প্রতিটি আকাঙ্খী স্নায়ুতে উন্মাদ কামনা জাগায়। অথচ সে যেন বাঘিনীর মুখ, গালের হাড় উঁচু, বাঁকা চোখ, ভরাট দুটো ঠোঁট–যে ঠোঁট দুটো চুমু খেতো, শুষে নিতে তার পুরুষাঙ্গের...না, এসব ভাবার অবকাশ নেই।

সে চট করে চেয়ার থেকে একটা কাপড় তুলে নিল। খানিকক্ষণ পর খেয়াল হল নিজের শার্টটাই সে রক্তাক্ত মুখের ওপর চেপে ধরেছে।

ল্যাংটো দোনাতেল্লা তখন গলা ফাটাচ্ছেমরে যা, তুই নিপাত যা! বেশ্যাবাজ পুরুষ কোথাকার। আমি যখন তোকে ছেড়ে দেব, আর কোনো বেশ্যা আসবে না তোর সঙ্গে ইয়ে করতে।

ইভো অনেক ভেবেছে। কী করে ওই নোংরা বিশ্রি ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল। সে ফুর্তিবাজ, বেপরোয়া। ইতালির পুরুষেরা তাকে হিংসে করত। মেয়েমানুষের সঙ্গে ফুর্তি করাকে সে সম্মানজনক মহৎ কাজ বলে মনে করে। এটাই তার জীবনদর্শন। তাই তাকে সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হত। সুন্দরী মেয়েরা তাকে ঘিরে থাকত। পুরোনো প্রেমকে সরিয়ে রেখে সে নতুন প্রেমের সন্ধানে ছুটে যেত। বলা ভালো, নতুন প্রেম তাকে পুরোনো সহবাসের কথা ভুলিয়ে দিত।

তার তালিকায় ভায়া অ্যাপপিয়ার সাধারণ বেশ্যা থেকে কনদোত্তির হাইফ্যাশন মডেল কেউ বাদ নেই।

কিন্তু আমেরিকান মেয়ে না, ওরা বড্ড বেশী স্বাধীন। তাছাড়া ওদের ভাষা বড্ড নীরস। যেমন গিসেপে ভারদিকে ওরা বলে জো গ্রীন। ওদের কাছে কিছু পাওয়ার আশা করা যায় না।

সাধারণত এক ডজন মেয়েকে ইভো একসঙ্গে নাচায়। সে ধাপে ধাপে প্রেমের শেষ পর্যায়ে পৌঁছোয়।

প্রথম ধাপে সে মেয়েটির সঙ্গে আলাপ জমায়। ফুল পাঠায়, ফোন করে, কামনা জাগানো কবিতার পাতলা বই উপহার দেয়। এইভাবে দুটো ধাপ উঠে আসে। গয়নাকাপড় উপহার দেয়। ডিনার খাওয়ায়। এরপরে আসে সেই আকাঙ্ক্ষিত ধাপটি। মেয়েটির সঙ্গে সে মিলনে প্রবৃত্ত হয়।

এই মুহূর্তটি ইভোর কাছে চলচ্চিত্রের ছবির মতো। ওইদিন তার ছোট্ট ফ্ল্যাটটিতে মেয়েটির পছন্দ মতো মিউজিক বাজানো হয়। নয়তো অপেরার আয়োজন হয়। মেয়েটির পছন্দ মতো খাবার ইতভা নিজে হাতে রান্না করে। ডিনারের পর বিছানায় শুয়ে উলঙ্গ নারী-পুরুষ শ্যাম্পেন খাবে, এমন ব্যবস্থাও রাখে। প্রেমের এই চতুর্থ স্তরটি ইভোর খুব। পছন্দের।

এরপরে আসে পঞ্চম ধাপ। মেয়েটিকে বিদায় জানাতে হবে। ভালো ভালো উপহার তার হাতে তুলে দিতে হয়। হৃদয়বিদারক বক্তৃতা শোনাতে হয়। কান্নাকাটি করতে হয়।

.

কিন্তু এসব পুরোনো কথা। আয়নায় নিজের মুখ দেখল ইভা। রক্তাক্ত, আঁচড়ানো, কামড়ানো। নিজেকে দেখে নিজেরই ভয় হয় তার।

–ডার্লিং, দেখো কী হাল করেছ?

জড়িয়ে ধরতে গিয়ে বাধা পায় ইভো। তার পিঠে দোনাতেল্লার নখ বুনো জন্তুর মতো আঁচড় দেয়। ইভো যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে।

–নে, কত চেঁচাবি, চেঁচা। দোনাতেল্লার তীক্ষ্ণ গলা। একটা ছুরি হাতের সামনে পেলে তোর ওটা কেটে মুখে ঢুকিয়ে দিতাম। আর চেঁচাতে পারতিস না।

–কী হচ্ছে? আস্তে বলো। বাচ্চারা শুনতে পাবে।

বাচ্চারা শুনুক। তাদের জানা দরকার, তাদের বাবা নরকের একটা কীট।

–তুমি আমার বাচ্চাদের মা। তোমার মুখের এমন নোংরা কথা?

–ও, নোংরা কথা শুনতে ভালো লাগছে না! তাহলে আমি যা চাইছি, তাই দে।

দশ লাখ টাকা চাইলেই তো পাওয়া যায় না। সময় লাগে জোগাড় করতে। আমি দেখছি কী করা যায়। ইভোর জামা রক্তে ভিজে গেছে।

দোনাতেল্লা বাঁদরের মত লাফাচ্ছে...সেই ছন্দে দুলছে তার বৃহৎ স্তনদুটো।

সত্যি কী রমণীয়! এ মেয়ের তুলনা হয় না!

অথচ আয়নায় দেখতে পাচ্ছে ইভো। রক্তাক্ত মুখে দোনাতেল্লার নখের আঁচড়।

–হে ঈশ্বর, একে কী করে বোঝাই! ইভোর গলায় আক্ষেপ।

রফ পরিবারের ইতালিয়ান শাখার একমাত্র উত্তরাধিকারী সিমনেত্তা রফ, ইভ পালাজজি তার স্বামী।

ইভো তখন যুবক এক স্থপতি। সিমনেত্তার সঙ্গে প্রথম আলাপ থেকেই ওরা গভীরভাবে মেলামেশা করল। প্রথম রাতেই প্রেমের চতুর্থ ধাপে পৌঁছে গেল ওরা। বিয়ে হল। ইভো স্থপতির চাকরি ছেড়ে দিল। যোগ দিল রফ অ্যান্ড সন্স-এ।

রোমের যে এলাকাটা হতভাগ্য মুসোলিনি অনেক আশা নিয়ে গড়ে তুলেছিল, সেখানেই ওদের কোম্পানির অফিস।

ইভা বুদ্ধিমান। তাকে সবাই পছন্দ করে। সে সবসময় খুশমেজাজে থাকে। বন্ধুরা তার এই স্বভাবেঈর্ষান্বিত হয়। এজন্যই সে সহজে সফলতা লাভ করে। কিন্তু সে যে আবেগপ্রবণ, একটুতেই চটে যায়, মানুষ খুন করা তার কাছে কোনো ব্যাপার নয়–তার চেহারার এই কুৎসিত রূপটা সে কারো কাছে প্রকাশ করে না।

বেশ সুখেই তাদের দাম্পত্য জীবন কাটছিল। ইভোর মনে আশঙ্কা ছিল, স্ত্রীর বাহুবন্ধনে ধরা পড়ে হয়তো বা তার পৌরুষের অপমৃত্যু ঘটবে। কিন্তু সেসব কিছু হল না।

সিমনেত্তার বাবা মেয়ে-জামাইকে একটা বাড়ি উপহার দিয়েছিল। রোমের পঁচিশ মাইল উত্তরে প্রাচীর ঘেরা বিরাট প্রাসাদ। দরজায় ইউনিফর্ম পরা প্রহরী।

সিমনেত্তা ঘরনী হিসেবে দারুণ। স্বামীর প্রতি কর্তব্য পালন করে ঠিক ঠিক। কিন্তু কোনো কারণে রেগে গেলে আর রক্ষে নেই।

একবার সিমনো তার স্বামীকে সন্দেহ করল, ইভো নাকি ফার্মের মাল কিনতে যাওয়ার অজুহাতে এক মহিলার সঙ্গে ব্রাজিলে গেছে।

ইভো জানাল, অভিযোগটা মিথ্যে। চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হল। ভাঙচুর, ঘর তছনছ। একটা পেয়ালা পিরিচ পর্যন্ত গোটা রইল না। আসবাবগুলো অভ্রান্ত লক্ষ্যে এসে পড়ল ইভোর মাথায়।

সিমনেত্তা মাংস কাটার ছুরি হাতে তেড়ে এল–তোমাকে খুন করে ফেলব, তারপর নিজেকে।

কোনোরকমে সে যাত্রা ইভো বউকে সামাল দিল। মারামারি করতে করতে দুজনে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। ইভো বউয়ের পোশাক টেনে ছিঁড়ে দিল। সিমনেত্তা তখন উদোম উলঙ্গ। ওরা সব রাগ দ্বেষ ভুলে গিয়ে শরীরের খেলায় মেতে উঠল।

এরপর থেকে ইভো খুব সতর্ক হয়ে গেল। গার্লফ্রেন্ডকে জানিয়ে দিল, তাকে নিয়ে আর কখনও বাইরে বেড়াতে যাবে না। বউ সন্দেহ করবে, নিজের কাজে এমন কোনো ফাঁক রাখে না সে।

সিমনেত্তা যুবতী। সুন্দরী, বুদ্ধিমতী এবং ধনী। তাদের দুজনের পছন্দও এক। তারা এমনিতে সুখী দম্পতি। অন্য মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে করতে যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন ইভো ভাবে বউয়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করাটা ত্যাগ করতে হবে। কথাটা মনে পড়লে দার্শনিকের মতো কাঁধ ঝাঁকায়–এই সব রমণীদের সুখ দেওয়ার জন্যও তো পুরুষকে চাই।

তিন বছর কেটে গেছে। ব্যবসার ব্যাপারে ইভো সিসিলিতে এল। দেখা হল দোনাতেল্লা স্পলিনির সঙ্গে। ইভোর চোখে সিমনেস্তা যেন মানজু-র তৈরি স্লিম ও মিষ্টি মেয়ের যুবতী শরীর। আর দোনাতেল্লা চিত্রকর ব্যুরেনস-এর আঁকা ছবি, ভরাট সেক্স তার। ইভো সেই কামনার আগুনে জ্বলে ওঠে।

প্রথম পরিচয়ের পরের দিনই ওরা বিছানায় গেছে। ইভোর নিজের পৌরুষের ওপর দারুণ আস্থা ছিল। কিন্তু বিছানায় দেখা গেল, দোনাতেল্লা শিক্ষয়িত্রী আর ইভো তার ছাত্র। কামনার চূড়ায় ইভোকে তুলে দিয়ে এমন সব খেলা করে যা ইভো কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি। প্রেমের, সেইসব অনুভূতি উপভোগ করতে করতে ইভো ভাবে, দোনাতেল্লাকে ছেড়ে যাওয়া মানে নিজের পায়ে কুড়ুল মারা।

দোনাতেল্লা হল ইভোর রক্ষিতা। স্ত্রী ও রক্ষিতা ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে বিছানা ভাগ করতে পারবে না ইভো–এমনই শর্ত ছিল তার। ইভো সে শর্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে। দু-দুটো কামনাতুর মেয়েকে সে ভোগ করছে। ক্লান্তি নেই এতটুকু। দোনাতেল্লার সঙ্গে শুলে ভাবে সিমনেত্তার কথা। ওর মিষ্টি সেক্সি শরীরের কথা ভেবে ইভোর শরীরে কামনা জাগে। আবার সিমনেত্তার সঙ্গে যখন সে মিলিত হয় তখন দোনাতেল্লার উদ্ধত দুটি স্তন ও স্ত্রী অঙ্গ তাকে বুনো জানোয়ার করে তোলে। একজনকে ভোগ করলে অন্যজনকে সে যেন কাছে পায়। এই ব্যাপারটা ইভোর খুব ভালো লাগে।

ইভো দোনাতেল্লাকে একটা সুন্দর ফ্ল্যাট উপহার দিয়েছে। অবসর সময়ে সে সেখানে চলে যায়। ট্যুরে যাবার নাম করে, অফিসে যাওয়ার পথে বা কাজে ফাঁকি দিয়ে সে দোনাতেল্লার সঙ্গে মিলিত হয়।

সমুদ্র যাত্রার সেই পাঁচটা দিন ইভাকে দারুণ সুখ দিয়েছিল। জাহাজে করে স্ত্রীকে নিয়ে ইভো ইয়র্ক যাচ্ছিল। সেবার নীচের তলার কেবিনে সে তার রক্ষিতাকে রেখেছিল।

.

সন্ধ্যাবেলা। ইভ শুনল, সিমনেত্তা গর্ভবতী। এর এক সপ্তাহ পরে দোনাতেল্লা জানাল, তার বাচ্চা হবে। আনন্দের সাগরে ভেসেছে ইভো। সে মাঝে মাঝে কাম দেবতার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়–কেন তোমরা আমার প্রতি এত সদয় হয়ে উঠেছ?

যথাসময়ে সিমনেত্তা একটি মেয়ে উপহার দিল ইভোকে আর দোনাতেল্লা একটি ছেলে। দেবতাদের দয়ার সীমা নেই। কয়েক মাস কেটে গেল। ওরা আবার গর্ভবতী হল। ন-মাস পরে দোনাতেল্লার আবার একটি ছেলে আর সিমনেত্তার একটি মেয়ে হল।

চারমাস পরে আবার দুজনে একই সঙ্গে গর্ভবতী হল। এবার একই দিনে দুজনের বাচ্চা হল। সিমনেত্তা রয়েছে সালভাতোর মানজিতে আর দোনাতেল্লা সান্তা সিয়ারা ক্লিনিকে। ইভোকে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে। একবার সালভাতোর পরক্ষণেই সান্তা সিয়ারা।

র‍্যাকোর্দো অ্যানুলায় রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা বেশ্যাদের দিকে হাত নাড়ে ইভো। অবশ্য তাদের দেখার মতো ফুরসত পায় না। তবুও, ওদের সে ভালোবেসে ফেলেছে।

এবারেও সিমনেত্তা মেয়ে কোলে নিয়ে বাড়ি ফিরল। আর দোনাতেল্লা ছেলে। ইভো ভাবল, ছেলেগুলো যদি সিমনেত্তার হত, তাহলে তারা আইনগতভাবে বাবার পরিচয় লাভ করত। অবশ্য এর জন্য ইভোর সুখে কোনো ভাটা পড়ে না। ওদের জন্মদিন, যে সন্তের কাছে ওদের উৎসর্গ করা হয়েছে, তার নামে চিহ্নিত। ইভ কিছু ভোলে না। সে বাচ্চাদের খুব ভালোবাসে। ছেলেদের নাম ফ্রানসেসকো, কালো ও লুকা। আর মেয়েরা হল ইসাবেল্লা, বেনেদেত্তা ও ক্যামিল্লা।

ছেলেমেয়েরা ধীরে ধীরে বড়ো হয়। ইভোর দায়িত্ব এখন বেড়ে গেছে। দু-দুটো সংসার সামলায়। ভায়া কার্সিয়ায় সন্ত দোমিনিকের কনভেন্টে সে মেয়েদের ভর্তি করে দিল। ছেলেরা তার থেকে অনেক দূরের স্কুলে ম্যাসিমোর জেসুইট স্কুলে। বউ, রক্ষিতা, ছটি

ছেলেমেয়ে নিয়ে ইভোর সংসার। সে এলেমদার বটে! আদর্শ স্বামী, প্রেমিক ও পিতা। বউ ও মেয়েদের সঙ্গে সে এক্সমাসের দিনটা কাটায়। বাইরে যায় না। ছেলেদের জন্য সে রেখেছে বেফানা উৎসবের দিনটা অর্থাৎ ৬ই জানুয়ারি। সে সেদিন ছেলেদের হাতে ব্ল্যাক রক ক্যান্ডি উপহার তুলে দেয়।

সুন্দরী বউ আর রক্ষিতা, মিষ্টি হাসিখুশি আর চালাক ছেলেমেয়ে নিয়ে গর্ববোধ করে ইভো।

কিন্তু...

কিন্তু একদিন সেই সুখের জীবনে আগুন লাগল।

ইভো

যেমন কোনো বড়ো দুর্ঘটনা হয়, সাবধান হওয়ার সামান্যতম সুযোগও পাওয়া যায়নি।

ব্রেকফাস্ট খাওয়া শুরুর আগে সিমনেত্তার শরীর নিয়ে খেলেছে ইভো। তারপর অফিসে গেছে। সিমনেত্তার হুকুমে অফিসে পুরুষ সেক্রেটারি রাখতে হয়েছে। ইভো তাকে জানাল, বিকেলে সে অফিসে থাকবে না।

খুশমেজাজে পথ হাঁটছে ইভো। বিকেলটা কীভাবে কাটাবে, তাই ভাবছে। লুনগো তেভেরের রাস্তা দিয়ে চলেছে সে। গত সতেরো বছর ধরে এখানে নির্মাণের কাজ

চলছে। করসো ফ্রসিয়ার মতেমিগাও সেতু পেরোল সে। সেখান থেকে ভিয়ার গ্যারেজে পা রাখল ঠিক তিরিশ মিনিট পর।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেই ভুরু কোঁচকাল ইভো। কী হয়েছে? দোনাতেল্লাকে ঘিরে। তিন ছেলে বসে আছে কেন?

ইভো সামনে এসে দাঁড়াল। দোনাতেল্লা মুখ তুলে তাকাল। সেখানে ঘেন্নার বীভৎস ছবি। ইভো কি তবে ভুল ঘরে ঢুকে পড়েছে!

কী হয়েছে? তোমরা এমন করছ কেন?

দোনাতেল্লা লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। ছুঁড়ে দিল ওরজি ম্যাগাজিনের কপি–দেখো, তোমার কীর্তি।

ইভো ম্যাগাজিনটা হাতে তুলে নিল। চোখ রাখল কভারের ওপর। ফটো–তার এবং সিমনেত্তা ও তিন মেয়ে। বড়ো বড়ো করে ছবির নীচে লেখা-সুখী পরিবার। :

ইভোর চোখ কপালে। আরে সে তো ভুলেই গিয়েছিল। কয়েক মাস আগে তার সম্বন্ধে কিছু লিখতে চেয়েছিল। ইভো রাজি হয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা যে এত বড়ো হয়ে উঠবে তা সে কল্পনাও করতে পারেনি।

ইভো রক্ষিতা ও ছেলেদের কান্না থামাতে বলল–শোনো, আমার কথা তোমরা শোনো।

-তোমার কথা আর কী শুনব? আমার ছেলেররা স্কুল থেকেই সব বুঝে শিখে এসেছে। বেজন্মা বলে ওদের সবাই বিদ্রূপ করেছে। ওরা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এসেছে। আমার বাড়িওলা, প্রতিবেশীরা আমাদের কাছ পর্যন্ত ঘেঁষছে না। যেন আমরা সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত। এখানে আর আমাদের থাকা চলবে না। মান-সম্মান সব গেল।

-কী বলছ?

–আমার ছেলেদের নিয়ে আমি রোম ছেড়ে চলে যাব।

তোমার ছেলে? আমার নয়?

–আমাকে নতুন করে তুমি কিছু বোঝাতে এসো না, তাহলে খুন হয়ে যাবে। হায় ঈশ্বর, একী হল! ইভো ভাবতে থাকে, আমার ভাগ্যে এসব ঘটতে পারে না। দোনাতো তখনও বলে চলেছে–যাওয়ার আগে দশ লাখ নগদ টাকা আমার চাই।

দশ লাখ! ইভোর ঠোঁটে অবিশ্বাসের হাসি।

–হয় টাকা দেবে, নয়তো তোমার বউকে ফোন করে সব জানিয়ে দেব।

.

এরপর কেটে গেছে দু-দুটো মাস। দোনাতেল্লা এখনও টাকা পায়নি। অবশ্য মুখে যা বলেছিল, কাজে তা করেনি। কিন্তু চাপ দিচ্ছে। অফিসে ফোন করছে, বলছে, ইভো কীভাবে টাকা পাবে, তা তার জানার দরকার নেই। কিন্তু দশ লাখ টাকা তার চাই।

ইভো ভাবে–রফ অ্যান্ড সন্সের শেয়ার বিক্রি করা ছাড়া তার কোনো উপায় নেই। কিন্তু বাদ সেধেছে ওই স্যাম রফ। ওর জন্যই ইভোর জীবনে দুঃস্বপ্ন নেমে এসেছে। ভবিষ্যৎ অন্ধকার। স্যাম রফের ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য উপযুক্ত লোকেদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে হবে।

দোনাতেল্লা এই ঘটনার পর থেকে নিজেকে ইভোর কাছ থেকে গুটিয়ে নিয়েছে। সে তার শরীর ছুঁতে দেয় না। এ যে কী চরম ব্যথা ইভোর কাছে। তবে হ্যাঁ, ইভো ছেলেদের সঙ্গে প্রত্যেক দিন দেখা করার অনুমতি পেয়েছে। কিন্তু দোনাতেল্লা শুনিয়ে দিয়েছে, যেদিন সে টাকা দিতে পারবে ঠিক সেদিনই সে তার বেডরুমে ঢোকার অনুমতি পাবে।

ইভো ভেবেছিল, দোনাতেল্লার শরীরে শরীর মিলিয়ে তার রাগ ভাঙাবে। তাই সে একদিন জানালো টাকার জোগাড় হয়ে গেছে। এক্ষুনি আসছি!

দোনাতেল্লাকে নিয়ে ইভো শোবার ঘরে ঢুকল। দোনাতেল্লা পোশাক ছেড়ে তৈরি। ইভোও কাপড়জামা ছেড়ে ফেলেছে। ঠিক সেই সময় সে বলল–ডার্লিং, টাকাটা রেডি হয়নি, তবে খুব তাড়াতাড়ি....

দোনাতেল্লা তিড়িং করে লাফিয়ে উঠেছে। ইভোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে আঁচড়ে কামড়ে রক্তাক্ত করে দিয়েছে।

.

ভিয়া ক্যাসিয়ার জনাকীর্ণ রাজপথ দিয়ে ইভো গাড়ি ড্রাইভ করে চলেছে। যেতে হবে ওলগিয়াতায়, তার বাড়ি সেখানে। আয়নার মুখ দেখল ইভে। রক্ত ঝরা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু আঁচড়ানোর দাগ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। শার্টটা রক্তে ভেজা।

সিমনেত্তার সামনে দাঁড়াবে কী ভাবে? কী জবাব দেবে? বলবে কী? একটা মেয়ের সঙ্গে শুয়েছিল, সে গর্ভবতী হয়েছে। কিন্তু তিনটে ছেলে? না, এসব বলা চলবে না। তাহলে? এদিকে বাড়িতে তাকে ফিরতেই হবে। কয়েকজন অতিথি আসার কথা। ডিনারে যোগ দিতে হবে। কে তাকে এই বিপন্ন অবস্থা থেকে বাঁচাবে? বাঁচাতে পারেন একমাত্র সন্ত জোররা। তিনি অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারেন।

ভিয়া ক্যাসিয়ার ধারে একটা সাইনবোর্ড দেখে সে গাড়ি থামাল।

আধঘন্টা পরে বাড়ি ফিরে এল ইভে। প্রহরীরা তার দিকে অবাক চোখে তাকাল। বাড়ির ভেতরে ঢুকতে যেতেই থমকে দাঁড়াল। সিমনেত্তা আর বড়ো মেয়ে ইসবেলা তার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

সিমনেত্তা আঁতকে উঠে বলল–ডার্লিং, তোমার এ দুর্দশা হল কীভাবে?

ইভো কোনোরকমে উত্তর দিল,আমার বোকামির ফল।

সিমনেত্তা মুখের আঁচড়ের দাগ লক্ষ করল। তার চোখ ছোটো হয়ে গেল। নিস্তেজ গলায় বলল–আঁচড়ের দাগ মুখে? কে এসব করেছে?

–তাইবেরিও।

পিঠ থেকে একটা বিশ্রী কুৎসিত ধূসর রঙের বেড়াল তুলে আনল ইভো। বেড়ালটা লাফিয়ে চলে গেল অন্যদিকে।

-বেড়ালটা কিনে নিয়ে এলাম ইসাবেলার জন্য। বাস্কেটে পুরতে গিয়ে আঁচড়ে কামড়ে দিল।

–আহা, বেচারা! চলো, ওপরে চলো। শুয়ে পড়ো। ডাক্তারকে খবর দিয়েছি। দাঁড়াও আগে আয়োডিন লাগিয়ে দিই।

না-না, ওসব কিছু লাগবে না।

সিমনেত্তা ওকে জড়িয়ে ধরতে গেল।

ইভো মুখ বিকৃত করে বলল–সাবধানে, পিঠেও আঁচড়ে দিয়েছে।

-সত্যি, তোমার ভীষণ লেগেছে, তাই না। কষ্ট হচ্ছে?

আমি ভালো আছি। আমার কোনো ব্যথা নেই।

এমন সময় কলিংবেল বেজে উঠল।

–আমি দেখছি, ইভো বিছানা থেকে নামল, অফিস থেকেও আসতে পারে, কাগজপত্র পাঠাবার কথা।

দরজা খুলে দাঁড়াল ইভো।

–সিনর পালাজজি?

–হ্যাঁ, আমি।

ধূসর রঙের ইউনিফর্ম পরা পিওন ওর হাতে একটা খাম তুলে দেয়।

খাম খোলে ইভো, রিস্ উইলিয়ামস পাঠিয়েছে। খবরটা পড়ে সে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ওপরের ঘরে উঠে যায়। সেখানে অতিথিরা তার জন্য অপেক্ষা করছে।

.

০৪.

বুয়েনস আইরেস। সোমবার। ৭ই সেপ্টেম্বর। বিকেল ৩টা।

আর্জেন্টিনার রাজধানী। ধূসর শহরতলি। চার মাইল সারকিট আর একশো পনেরো ল্যাপ-এর মোটর রেস চ্যাম্পিয়ানশিপ-এর আয়োজন হয়েছে। পঞ্চাশ হাজার দর্শক ভিড় জমিয়েছে। কিংবদন্তির নায়করা এই চ্যাম্পিয়ানশিপে যোগ দিয়েছে। নিউজিল্যান্ডের ক্রিস

অ্যামন, ল্যাঙ্কাশায়ারের ব্রায়ান রেডম্যান, আলফা-রোমিও টিপো ৩৩ গাড়িতে ইতালিয়ান চ্যাম্পিয়ান আদ্রিয়া দি অ্যাদ, মিসিমের মার্ট ফরমুলা ওয়ানে ব্রেজিলের কারলোস মার্কো। বেলজিয়াম চ্যাম্পিয়ান জ্যাকি ইক এবং বি আর এম গাড়িতে সুইডেনের রেইনে উইজেল।

ট্র্যাকটা দেখলে মনে হয় রামধনুর সাত রঙলাল, সবুজ, কালো, সাদা, সোনালি।

ফেরারি, ব্রাভাম, ম্যাকলারেন এম ১৯-এ এস এবং লোটাস ফরমুলা ৩ এস।

ক্রিস অ্যামন চতুর্থ স্থানে ছিল। তার থ্রটল জ্যাম হয়ে গেছে। ইঞ্জিন বন্ধ করে গাড়ি থামাতে গিয়েও বাধা। ব্রায়ান রেডম্যানের গাড়ি এসে তার সামনে দাঁড়াল। ব্যাস দুজনেরই জেতার আশা ধ্বংস হল।

রেইনে উইজেল ছিল প্রথমে। বাঁয়ে ঘুরতে যেতে বিকল হল তার বি আর এম-এর গিয়ার বক্স। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে আগুন লেগে গেছে। গাড়িটা পাক খেতে শুরু করেছে। তার ঠিক পেছনে ছিল জ্যাকি ইকস। ফলে তাদের দুজনকেই সেখানেই প্রতিযোগিতায় সমাপ্তি জানাতে হল।

জনতার উল্লাস শোনা যাচ্ছে।

পরপর তিনটি গাড়ি এগিয়ে চলেছে। প্রথমে আর্জেন্টিনার জোর্জে আমানদারিস্। সে সুরতিস ড্রাইভ করছে। পেছনে লাল-সাদা মার্কা গাড়ি। সুইডেনের নিস নিলসনের। তার

পেছনে যাচ্ছে ফ্রান্সের মারতেইল-এর ফেরারি ৩১২ বি-২। জোর্জে আমানদারিস আর্জেন্টিনার বাসিন্দা। তাই, জনতা তার উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে সমর্থন জানাচ্ছে।

পেছনে ছুটে আসছে একটা রেস ট্র্যাক। ফরাসি ড্রাইভার। প্রথম কেউ লক্ষ করেনি। অবশেষে সকলের নজরে এল। সেটা দশম থেকে সপ্তম তারপর পঞ্চমে চলে এল। প্রথম তিনটে গাড়ি ঘণ্টায় ১৮০ মাইল গতির চেয়েও বেশি জোরে ছুটছে। পেছন থেকে তাদের দিকে বিপজ্জনক ভাবে ছুটে আসছে ব্রানডস হ্যাঁচ বা ওয়াটকিনস গ্লেনের রেস ট্র্যাক। আর্জেন্টিনার এবড়ো থেবড়ো রেস ট্র্যাকে ওটা আত্মহত্যার সমান। ট্র্যাকের পাশে দাঁড়িয়ে রেফারি, পরনে লাল কোট পরা, সাইনবোর্ড তুলে ধরেছে–আরও পাঁচটা ল্যাপ বাকি আছে।

ফরাসি ড্রাইভার সোনালি-কালো ফেরারি গাড়ি নিয়ে তৃতীয় গাড়িটাকে পেছনে ফেলে নিলসনের মাত্রা গাড়ির পাশাপাশি চলে এল। নিলসন ওর পথ রুখে দেওয়ার চেষ্টা করল। পেছনে আসছে একটা জার্মান কার। ফরাসি গাড়িটা আচমকা পিছিয়ে গেল। এসে পড়ল নিলসনের মাত্রা ও জার্মান গাড়ির মাঝখানে। তারপর হঠাৎ গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল। দুটো গাড়ির মাঝখানের খালি জায়গা ধরে সেটি এগিয়ে গেল। ফরাসি ড্রাইভারের গাড়ি এখন দ্বিতীয় স্থানে চলে এসেছে। ড্রাইভারের বাহাদুরি দেখে জনতা হাততালি দিয়ে তাকে অভিনন্দিত করল।

তিনটে গাড়ি পরপর চলেছে–আমানদারিস, মারতেইল, নিলসন। এখনও তিনটে ল্যাপ বাকি। যেভাবেই হোক আমানদারিসকে জিততেই হবে। ফরাসি ড্রাইভার ভালো, কিন্তু তাকে হারাতে পারবে না। আমানদারিস দেখল, ফরাসি ড্রাইভার মারতেইলের কালো

ফেরারি গাড়িটা ওর পাশে এগিয়ে আসছে। মারতেইলের চোখে গগলস। কাঁচে ধুলো পড়েছে। তার নীচে দেখা যাচ্ছে কঠিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মুখ। আমানদারিস একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। স্পোর্টসম্যানের পক্ষে নীতিবিরুদ্ধ এমন কাজই এখন সে করবে। জেতাটাই তার কাছে এখন বড়ো কথা।

একপাশে উঁচু পাড়। গাড়ি বাঁক নিচ্ছে। এই জায়গাতেই বেশির ভাগ গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটায়। ফেরারি গাড়ির ড্রাইভারের দিকে তাকালো আমানদারিস। হঠাৎ অ্যাকসিলারেটর থেকে পা সরিয়ে নিল। আচমকা গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। ঠিক সেই সময় ফরাসি ড্রাইভার তার গাড়িকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সুরতিসের পাশ দিয়ে। ঠিক তখনই আমানদারিস তার গাড়ি ডানদিকে ঘোরালো, ঠিক ফেরারির লাইনে। বাঁচতে হলে ফরাসি ড্রাইভারকে ট্রাকের মায়া ত্যাগ করে পাড়ে উঠতে হবে।

ফরাসি ড্রাইভার আচমকা কোণঠাসা হয়ে গিয়ে ঘাবড়ে গেল।

আমানদারিস আপন মনে বলল সালুদ!

পরক্ষণেই মারতেইল তার গাড়ি ঘোরালো আমানদারিসের দিকে। আর মাত্র তিন ফুট। তখন দুটো গাড়ি পাশাপাশি এসে পড়েছে। সংকট এড়াতে আমানদারিস গাড়ি বাঁদিকে ঘুরিয়ে ব্রেক কষল। অথচ তাকে একটুও না ছুঁয়ে ফরাসি ড্রাইভার মারতেইলের ফেরারি সীমানায় পৌঁছে গেল। জিতে গেল। জনতা উল্লসিত। আর্জেন্টিনাবাসীদের তখন আর আমানদারিসের দিকে নজর নেই। সবাই এসে ভিড় করেছে ফরাসি ড্রাইভারকে ঘিরে

সংবর্ধনা জানাবে বলে। ড্রাইভার চোখ থেকে কালো গগলস আর মাথা থেকে হেলমেট খুলে ফেলল।

আরে, এ যে মহিলা!

গমের মতো চুলের রং। ছোটো করে ছাঁটা। নিটোল প্রতিমার মতো মুখ। শক্ত, ধারালো, ক্লাসিক, হিমশীতল, কিন্তু সুন্দর। তার শরীর উত্তেজনায় কাঁপছে। মৃত্যুপথযাত্রী আমানদারিসের দিকে তাকাল সে। লোকটাকে সে মরতে পাঠিয়েছে।

এদিকে শোনা গেল লাউডস্পিকারে ঘোষিত হচ্ছে ফেরারি গাড়ির ড্রাইভার, ফ্রান্সের হেলেন রফ মারতেইল আজকের রেসের বিজয়ী!

***

স্থান : বুয়েন্স আইরেস রি হোটেল। ফায়ারপ্লেসের সামনে কার্পেটের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে শার্ল। হেলেনের শরীরে পোশাক নেই। সে স্বামীর ওপর শুয়ে পড়ে। যৌনসঙ্গমের বিপরীত ও ক্লাসিক পোজে।

-প্লিজ, ওহ্, ক্রাইস্ট! শার্ল বলে ওঠে, ওরকম কোরো না।

তাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য শার্ল পীড়াপীড়ি করে, কিন্তু হেলেনের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তার কামনার পারদ তখন চড়চড় করে বাড়ছে। সে চাপের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। শার্লের চোখে জল এসে গেল।

শার্ল মনে মনে বলে আজ বিনা দোষে শুধু-শুধু আমি কষ্ট পাচ্ছি। আমি কী অপরাধ করেছি, হেলেন তা জানে না। জানতে পারলে কী যে হবে, শার্ল সে কথা ভেবে এখন থেকেই ভয় পায়।

***

হেলেনের টাকা ও নাম আছে। শার্ল তাই তাকে বিয়ে করেছিল। কিন্তু সে ভুল করে। টাকা তো পায়ইনি, স্বামীর মর্যাদাও পায়নি। কেবল ওর পদবীটা হেলেন নিয়ে নিল। সে এখন হেলেন রফ মারতেইল।

প্যারীর নামকরা এক ল ফার্মে জুনিয়র অ্যাটর্নি হিসেবে তখন শার্ল কাজ করছিল। কনফারেন্স রুমে মিটিং চলছে। ফার্মের চারজন সিনিয়র পার্টনার আর হেলেন সেই মিটিং এ ছিল।

শার্ল হেলেনের সম্পর্কে কিছু ভাসা ভাসা কথা শুনেছিল। সে শুনেছিল হেলেন রফ ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠানের একজন অংশীদার। বন্য ও উত্তেজনা পূর্ণ জীবনযাপন করে, স্কি খেলায় চ্যাম্পিয়ান। নিজের লিয়ার জেট নিজেই চালায়। নেপালে পর্বতারোহণে অংশ গ্রহণ করেছে। কার রেসিং-এ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। ঘন ঘন প্রেমিক বদলায় সে, যেন পোশাক বদলাচ্ছে ।

হেলেনের ফটো শার্ল দেখেছে প্যারী ম্যাচ আর জ্বর দ্য ফ্রান্স পত্রিকায়। ডিভোর্সের মামলার জন্য আজ সে ওই ফার্মে এসেছে। তবে শার্ল জানে না, এটা তার কত নম্বর

বিবাহবিচ্ছেদ। শালও ওসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না। তার ওপর ওরারফ ফ্যামিলি, তার আয়ত্তের বাইরে।

কিছু ডকুমেন্ট নিয়ে শার্ল ঢুকেছিল কনফারেন্স রুমে। সিনিয়ররা বসে আছেন। তাই সে কুণ্ঠিত ভাবেই ভেতরে ঢুকল। সাধারণত শার্ল একা থাকতেই ভালোবাসে। প্যারীর ছোট্ট এক অ্যাপার্টমেন্টে তার সুখের নীড়।

শার্ল পাকা অ্যাটর্নি হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু তার ওপর ভরসা করা যায়। কর্মঠ লোক। চল্লিশ ছুঁই ছুঁই শার্লকে দেখতে মোটামুটি আকর্ষণহীন। ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নেই। ঠিক যেন ভিজে বালি।

পরের দিন ফার্মের সিনিয়র পার্টনার মসিয় মিচেল সাকাদ তাকে তার ঘরে ডেকে পাঠালেন।

–হেলেন রফ তার মামলার দেখাশোনার দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে তোমাকে দিতে চাইছেন।

শার্ল অবাক আমাকে কেন মসিহঁ?

-সেটা আমি বলতে পারব না। তবে ওঁর কাজ ঠিকমতো যেন হয় লক্ষ রেখো। শার্ল হেলেনের ডিভোর্স কেসটা হাতে নিয়েছিল। সেই সুবাদে কয়েকবার তার সঙ্গে দেখা করতে হয়েছে, এবং ঘন ঘন।

হেলেন ফোন করেছে। তার ভিলায় ডিনারের নিমন্ত্রণ করেছে। অপেরায় নিয়ে গেছে।

শার্ল বোঝাবার চেষ্টা করেছে, কেসটা সামান্য। ডিভোর্স পেতে দেরি হবে না।

কিন্তু হেলেন বলেছে, শার্ল কাছে থাকলে তার সাহস বেড়ে যায়।

দেখা হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরে শার্লের প্রথম সন্দেহ হল। হেলেন রফ অভিজাত পরিবারের মেয়ে। আর শার্ল সাধারণ মানুষ। তবে কেন সে তাকে সব ব্যাপারে জড়াতে চাইছে! নিশ্চয়ই ও কোনো রোমান্টিক সম্পর্ক গড়তে চাইছে।

একদিন হেলেন জানালো-শার্ল, তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই।

এ তো অবিশ্বাস্য কথা! মেয়েদের সঙ্গ শার্ল পছন্দ করে না। হেলেনের প্রতি তার কোনো ভালোবাসা নেই। পছন্দ করে কিনা, তাও নিজের জানা নেই। আর বিয়ে?

হেলেন ফ্যাশানের আর-এক নাম, গ্ল্যামার কুইন। সেখান শার্ল মারতেইল একজন সাধারণ মাঝবয়সী উকিল। দুজনের মধ্যে অনেক তফাত। তার মধ্যে কী আছে, যা হেলেনকে আকৃষ্ট করছে? শার্ল বুঝে পায় না।

হেলেন নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থক। নির্দ্বিধায় বিপজ্জনক স্পোর্টসে অংশ নেয়, যেগুলো একমাত্র পুরুষদেরই ব্যাপার। বরং পুরুষ কেন, মেয়েমানুষেরা সমান অধিকার পাবে, এ নিয়ে হেলেন জোরদার আন্দোলন করে।

হেলেনের মতে, পুরুষ হল পোষা জানোয়ার, তাদের পোষ মানাও। ওরা ফাই-ফরমাস খাটবে, সিগারেট ধরিয়ে দেবে, বিছানায় আনন্দ দেবে। এটাই যথেষ্ট।

শার্ল মারতেইল তার কাছে এক বিস্ময়! গ্ল্যামার বয়, কোটিপতি, ডেয়ার ডেভিল, প্লেবয়–অনেক রকম পুরুষ দেখেছে হেলেন। কিন্তু শার্ল? শার্ল তাদের থেকে আলাদা। ও একতাল কাদা মাটির মতো। হেলেন ওকে নিজের মনের মতো গড়ে নেবে।

অতএব শার্লের আইবুড়ো নাম ঘুচল। স্বপ্ন হারিয়ে গেল। নলীতে তাদের বিয়ে হল। মন্টেকার্লোয় হনিমুন করল। শার্ল ওর ফার্মের কাজে ফিরে যেতে চাইল, কিন্তু হেলেন বেঁকে বসল। শেষ পর্যন্ত শার্ল রফ অ্যান্ড সন্সের প্যারী ব্রাঞ্চের দায়িত্বে এল।

অফিসের খুঁটিনাটি সে এসে বউকে বলত। বউয়ের উপদেশ, পরামর্শ ও সাহায্যে সে দ্রুত উন্নতি করল। ফলে অল্প দিনের মধ্যে প্যারী শাখার ইনচার্জ হল, বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস এর সদস্য হল। বলা যায় সামান্য এক উকিল বউয়ের কৃপায় পৃথিবীর বহুজাতিক এক বিশালতম ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য হয়েছে এখন। কিন্তু এর জন্য সে আনন্দিত নয়। বরং দুঃখ জাগে শার্লের মনে।

শার্ল এখন হেলেনের হাতের মুঠোয়। বউয়ের কথা মতো তাকে চলতে হয়। মাইনে পেয়ে সব বউয়ের হাতে তুলে দিতে হয়। পরিবর্তে হেলেন তাকে কিছু মাসোহারা দেয়। বেশি দরকার পড়লে তার কাছে হাত পাততে হয়।

স্বামীকে অপমান করে হেলেন সুখ পায়। হঠাৎ হঠাৎ অফিসে ফোন করে বলে–ম্যাসেজ ক্রিম কিনে নিয়ে আসবে।

শার্ল অফিস থেকে ক্রিম কিনে ফিরে এসে দেখে হেলেন উলঙ্গ একটা কুক্কুরির মতো পড়ে আছে। ও যেন সব সময় কামনার জ্বালায় জ্বলছে।

শার্লের মা ক্যান্সারে মারা গেছে। তখন তার বয়স বত্রিশ বছর। শার্ল যথাসাধ্য মায়ের সেবা শুশ্রূষা করেছে, কিন্তু বাঁচাতে পারেনি।

মায়ের মৃত্যুর পর নিজের জীবনে এক আশ্চর্য শূন্যতা বোধ করেছে শার্ল। কিন্তু সেক্সের প্রতি তার কোনো আগ্রহ নেই। এটা সে হেলেনকে বলেওছিল।

হেলেন হেসে বলেছিল–ওসব নিয়ে চিন্তা কেরো না। কেমন সুখ দেব, দেখে নিও।

এখন যৌনসঙ্গমের ব্যাপারটাকে শার্ল ঘেন্না করে। হেলেনের সঙ্গে সে পেরে ওঠে না। হেলেন যেন তার দুর্বলতায় বেশি খুশি হয়। স্বামীর পুরুষাঙ্গ নিয়ে এমন সব খেলা খেলে শার্লের গা গুলিয়ে ওঠে। একবার যৌন পুলকের চরম মুহূর্তে তার অন্ডকোষে হেলেন বরফের গুঁড়ো লাগিয়ে দিয়েছিল। আর একবার ইলেকট্রিক তার দিয়ে তার পায়ুতে শক দিয়েছিল। কী প্রচণ্ড কামোন্মত্তা!

মনে হয় শার্ল হেলেনের বউ, আর হেলেন তার স্বামী। এমন কোনো ব্যাপার নেই, যার সাহায্যে হেলেনকে শার্ল খাটো করতে পারে। হেলেনের মতো বুদ্ধি ধরে না সে। আইন? সে হেলেনও জানে। শার্লের থেকে ভালো ব্যবসা বোঝে। শার্লকে বসিয়ে রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ব্যবসা সংক্রান্ত কথা বলে।

শার্ল, ভেবে দেখো, রফ অ্যান্ড সন্সের কী ভীষণ ক্ষমতা! পৃথিবীর অর্ধেক দেশের অর্থনীতির বুনিয়াদ আমরা গড়তে যেমন পারি, তেমন ভাঙতে পারি। এই কোম্পানি আমারই চালানো উচিত। আমারই পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠান

এসব কথা বলতে বলতে হেলেন শার্লকে বিছানায় টেনে নিয়ে যায়। এসব মুহূর্তে তার যৌন কামনা অদ্ভুতভাবে বেড়ে ওঠে। শার্ল এসব ঘেন্না করে, হেলেনকেও সে পছন্দ করে না। তাকে ত্যাগ করতে পারলে বাঁচে। কিন্তু তার জন্য তো টাকার প্রয়োজন।

একদিন লাঞ্চের সময় শার্লের বন্ধু রেইনে দীশাপ শার্লকে একটা প্রস্তাব দিল–আমার কাকার বারগানজিতে একটা আঙুর খেত আছে। দশ হাজার একর। আমরা দুজনে মিলে সেটা কিনে নেব। আমরা প্রত্যেকে বিশ লাখ ফ্রা দেব। প্রথম বছরেই ডবল লাভ পাওয়া যাবে।

তার মানে চল্লিশ লাখ ফ্রাঁ। শার্ল ভাবল, হেলেনের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে তাকে এমন কোনো জায়গায় যেতে হবে যেখান থেকে সে আর তাকে খুঁজে পাবে না।

শার্ল বলল–ভেবে দেখছি।

কিন্তু টাকা জোগাড় হবে কীভাবে? বেডরুমের সিন্দুকে অনেক অব্যবহৃত গয়না আছে। শার্ল ঠিক করল, ওগুলোর সস্তা কপি করিয়ে সিন্দুকের ভেতরে রেখে, আসল জুয়েলারি বাঁধা দিয়ে টাকা জোগাড় করবে। তারপর লাভ হলে গয়নাগুলি ছাড়িয়ে নিয়ে এসে নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে দেবে। তারপরেই সে বেপাত্তা হয়ে যাবে।

কিন্তু এরপর থেকে সে যেন সত্যি সত্যি এক পোষা জন্তু হয়ে গেল। হেলেনের মুখোমুখি হলেই তার হাত-পা কাঁপতে থাকে, ঘাম হয়।

হেলেন চিন্তিত। ডাক্তার এল।

স্নায়বিক উত্তেজনা। বিশ্রামের প্রয়োজন। ঠিক হয়ে যাবে।

বিছানায় শুয়ে থাকা উলঙ্গ শার্লের দিকে তাকিয়ে হেলেন হেসে ওঠে।

ডাক্তার চলে গেলে সে পোশাক ছেড়ে শার্লের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শার্লের কোনো আপত্তি সে শুনতে রাজি নয়।

***

পরের সপ্তাহে হেলেন স্কি করতে গেল গারমিশ-পার্তেনকিরশেন-এ। যাওয়ার সময় স্বামীকে বলল রোজ রাতে বাড়িতে থেকো। আমি ফোন করব।

শার্ল বুঝি এই দিনটার প্রতীক্ষায় ছিল। তার আমন্ত্রণে জুয়েলার পিয়েরে রিচুদ বাড়িতে এল। জুয়েলারি কপি করতে সে ওস্তাদ।

সে বলল–মসিয়, এখন অনেকেই ডুপ্লিকেট জুয়েলারি তৈরি করাচ্ছে। আসল গয়না পরে রাস্তায় কেউ আজকাল বেরোয় না।

সমস্ত গয়নার নকল তৈরি হল। সেগুলো সিন্দুকে তুলে রাখা হল। আসলগুলো নিয়ে শার্ল জমা রাখল সরকারি সংস্থা ক্রেদিৎ মনিসিপালে। টাকা এনে বন্ধুকে দিল। আঙুর খেতের একজন অংশীদার হল শার্ল। হেলেন এসব কিছুই জানল না।

শার্ল তখন আঙুর চাষ সংক্রান্ত পড়াশোনা করছে। কতরকমের আঙুর আছে। কোন জমিতে ভালো আঙুর জন্মায়। মদ তৈরি হয় কীভাবে ইত্যাদি।

বন্ধু বলেছে–মদের দাম বাড়ছে। আমরা প্রথমে বছরেই ভালো লাভ পাব। শার্লের স্বপ্নে লাল সোনালি আঙুর এসে দেখা দেয়। ইতিমধ্যে ভ্রমণ সংক্রান্ত প্যামফ্লেটগুলো হাতে পেয়েছে শার্ল। সাউথ সী আইল্যান্ড, ভেনেজুয়েলা, ব্রেজিল। সে পালাবে। চলে যাবে এখান থেকে। কিন্তু রফ অ্যান্ড সন্সের অফিস আছে বিশ্বের বেশির ভাগ দেশে। যদি হেলেন তাকে খুঁজে পায়, তাহলে আর প্রাণে বাঁচিয়ে রাখবে না। তার আগে হেলেনকে খুন করতে হবে। কীভাবে? হাজার রকম ফন্দি আঁটে সে।

শার্লের এখন কোনো কিছুই অসহ্য লাগে না। হেলেনের অসভ্যতা, খারাপ ব্যবহার সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করে শার্ল। এমনকি তার শরীর নিয়ে হেলেনের পাশবিক খেলাও। সব–সব মুখ বুজে মেনে নিয়েছে শার্ল। মনে মনে এই ভেবে হেসে ওঠে সে–আর কতদিন আমায় নিয়ে খেলবি। বেশ্যা কোথাকার! তোর টাকা দিয়েই বড়োলোক হব। তারপর আমার টিকিও পাবি না।

হেলেন অর্ডার দেয়

–জোরে। আরো জোরে।

শক্ত করে ধরো।

–আঃ, থামছো কেন? শার্ল যেন সুবোধ বালক। ভেতরে ভেতরে হেসে ওঠে।

শার্ল বই পড়ে জেনেছে, বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতু আঙুর ফলার মোক্ষম সময়। সেপ্টেম্বরে আঙুর তোলার উপযোগী হয়ে ওঠে। তবে সমানভাবে রোদ-বৃষ্টি প্রয়োজন। তা নাহলে ভালো ফলন হয় না। বেশি রোদে আঙুরের সুগন্ধ নষ্ট হয়ে যায়। আর অতি বৃষ্টি আঙুরের স্বাদ নষ্ট করে দেয়। জুন মাস। আর মাত্র কয়েক সপ্তাহের প্রতীক্ষা। শার্লের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। বারগানজির আবহাওয়ার খোঁজ নেয় শার্ল। দিনে অন্তত দুবার।

শার্ল ঠিক করল। জামাইকায় যাবে। ওখানে রফ অ্যান্ড সন্সের কোনো অফিস নেই। রাউন্ড হিল বা অকোরিয়সে গেলে হেলেনের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। তাই সে মনে মনে ঠিক করল, পাহাড়ি অঞ্চলে ছোটো একটা বাড়ি কিনবে। কাজের জন্য লোক রেখে দেবে। মজায় দিন কাটিয়ে দেবে।

আগামী দিনগুলির কথা চিন্তা করে শার্ল অতীত বা বর্তমানকে ভুলে যায়। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের সূর্য-ধোয়া হাওয়া-লাগা গ্রীষ্মপ্রধান দ্বীপে সে জীবন কাটাবে। যেখানে হেলেন নেই, সে কেবল একা।

জুন মাসের প্রথম দিক। রোদ-বৃষ্টি সমানভাবেই ছিল। ছোটো আঙুর বড়ো হয়ে উঠছে।

জুনের মাঝামাঝি শুরু হল বৃষ্টি। দিনের পর দিন মুষলধারে বৃষ্টি হল বারগানজি অঞ্চলে। এখন আবহাওয়া রিপোর্ট শুনতেও ভয় পায় শার্ল।

রেইনে দীশাপের ফোন পেয়ে সে বুঝি একটু আশার আলো দেখতে পায়।

জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ বৃষ্টি কমে গেলে আঙুরের কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু বৃষ্টি থামল না। জুলাই মাসে রেকর্ড বৃষ্টি হল। সমস্ত আঙুর নষ্ট হল। শার্ল ব্যবসায় যে টাকা খাঁটিয়ে ছিল সব জলাঞ্জলি হল। এবার? এবার শার্ল কী করবে? সে আরো ভীত হয়ে পড়ল।

***

হেলেন খবর পাঠাল আগামী মাসে সে কার রেসে যোগ দিতে আর্জেন্টিনা যাচ্ছে।

শার্লের চোখের সামনে ভেসে উঠল–হেলেন স্পিডে গাড়ি ছুটিয়ে দিয়েছে। তারপরই গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট। হেলেন মরে গেছে।

হেলেন মরে গেলে সে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে। কিন্তু হেলেন হারতে জানে না। ও মরবে না। মরতে হলে শার্লকেই মরতে হবে।

রেসে জিতে এক শরীর কামোন্মাদনা নিয়ে ফিরে এসেছে হেলেন। ঝাঁপিয়ে পড়েছে শার্লের শরীরের ওপর।

এমন সময় দরজায় টোকা।

হেলেন বলল তুমি চুপ করে শুয়ে থাকো। আমি দেখছি।

আঁটসাট শরীরে সিল্কের পোশাক জড়িয়ে হেলেন দরজা খুলে দিল।

ধূসর রঙের পোশাক পরা পিওন দাঁড়িয়ে। একটা খাম এগিয়ে দিয়ে পিওন বলল–সিনর ও সিনরা মারতেইলের জন্য। স্পেশ্যাল ডেলিভারি।

পিওনকে বিদায় দিয়ে হেলেন ঘরে এসে ঢোকে। দরজা বন্ধ করে দেয়। খাম খুলে। মনে মনে বেশ কয়েকবার পড়ে নিল সে।

কী খবর?

শার্লের প্রশ্নের জবাবে সে জানালো, স্যাম রফ মারা গেছে। তার ঠোঁটে হাসির রেখা।

.

০৫.

লন্ডন। ৭ই সেপ্টেম্বর। বেলা দুটো।

পিকডিলি। সেন্ট জেমস স্ট্রিট। হোয়াইটস ক্লাব। এটা অষ্টাদশ শতাব্দীর জুয়া খেলার ক্লাব। বর্তমানে যা অভিজাত ইংরাজদের কাছে প্রথম শ্রেণীর ক্লাব হিসেবে বিবেচিত।

এই ক্লাবের সদস্য হতে চাইলে তিরিশ বছর অপেক্ষা করতে হয়। মেম্বার ও তাদের অতিথি ছাড়া অন্য কেউ এই ক্লাবে ঢুকতে পারে না।

বড়ো বড়ো ঘর। পুরোনো আসবাবপত্রে সাজানো। এমন সব আর্ম চেয়ার, যেখানে কম করে দুজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বসেছেন। আছে পুরোনো কালের টেবিল, চামড়ায় মোড়া কৌচ। ওপর তলায় উঠে গেছে বাঁকানো সিঁড়ি। ডাইনিং রুমে মস্ত বড় ডাইনিং টেবিল। একসঙ্গে তিরিশ জন মেম্বার বসতে পারে। এছাড়াও পাঁচটা সাইড টেবিল রাখা আছে। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আগমন ঘটেছে এখানে। লাঞ্চ বা ডিনার সেরে গেছে।

স্যার অ্যালেক নিকলস। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য। ওর বাবা ক্যারন ছিলেন অভিজাত। ওদের বংশের সকলেই এই ক্লাবের সদস্য। পরনে তার টুইড স্পোর্টস জ্যাকেট। আর স্ল্যাকস। রোগাটে চেহারা। মুখে অমায়িক হাসি আর আভিজাত্যের প্রকাশ। গ্লাউসেস্টারশায়ারের এস্টেট থেকে গাড়িতে চেপে এখানে এসেছে একটু আগে।

তার অতিথি জোন সুইনটন। পরনে তার পিন স্ট্রাইপ স্যুট। বড়ো বড়ো ডোরাকাটা শার্ট, টকটকে লালটাই ঝুলছে। এই শান্ত পরিবেশে এটা একেবারেই বেমানান।

ওরা বসেছে ঘরের এক কোণে একটা ছোটো টেবিলে।

মস্তো বড়ো ভীল চপের পড়ে থাকা টুকরোটা মুখে দিতে দিতে জোন সুইনটন বলল সত্যি, এখানকার খাবারটা ভালো।

-হ্যাঁ, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে শিখেছে। অবশ্য ভলতেয়ার বলেছিলেন, ইংরেজদের ধর্ম একশোটা হলে কী হবে, সস মাত্র একটা।

–ভলতেয়ার? কে সে?

একজন ফরাসি।

–ও, এবার কাজের কথা বলা যাক।

খানাপিনা শেষ করে কাঁটা চামচ সরিয়ে রেখে ন্যাপকিনে মুখ মুছল জোন।

–দু সপ্তাহের মধ্যে টাকা দেব বলেছিলাম। তা হচ্ছে না দেখছি। আরও সময় লাগবে। ওয়েটার কাঁচের বাক্স ভর্তি চুরুট দিয়ে গেল টেবিলে। অনেকগুলো পকেটে ভরে একটা চুরুট ধরালো জোন।

–স্যার অ্যালেক, আপনি আমার মনিবদের চেনেন না। ওরা আর ধৈর্য ধরতে পারছেন না। ক্ষেপে গেলে কী যে করে বসবেন, তা আপনি বুঝতে পারছেন না। আপনি কি ঝামেলা চান?

–সত্যি, আমার কাছে টাকা নেই।

–আপনি কি গরিব? আপনার বিষয় আছে। রফ পরিবারের মেয়ে আপনার মা। হাজার একরের ফার্ম আছে আপনার। টাউনব্রিজে মস্ত বড়ো বাড়ি। রোলস রয়েস আর লাল বেন্টলি গাড়ি আছে আপনার।

–ওগুলো বিক্রি করা যাবে না।

সুন্দরী বউ ভিভিয়ান?

স্যার অ্যালেকের মুখ রক্তিম হল। সে চায় না, এই লোকটা তার বউয়ের নাম মুখে আনুক। ওরা এক বাড়িতে বাস করে বটে, কিন্তু তাদের শোবার ঘর আলাদা। কখনো সখনো ভোরবেলা ঘুম থেকে সে যায় বউয়ের বেডরুমে। চাদর জড়ানো নরম শরীরটার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ওর মাথায় সোনালি চুল, বড়ো বড়ো হাল্কা নীল রঙের চোখ, চামড়া ক্রিমের মতো মোলায়েম।

এক চ্যারিটি হলে ভিভিয়ানের সঙ্গে তার প্রথম আলাপ হয়েছিল। থিয়েটারে ছোটোখাটো : পার্ট করত ভিভিয়ান।

দু সপ্তাহ পরে অ্যালেক মনে সাহস সঞ্চয় করে ভিভিয়ানকে থিয়েটার দেখতে আর ডিনার খেতে আমন্ত্রণ জানাল। নটিং হিলের এক তলার ফ্ল্যাটে ভিভিয়ান থাকত। তারা বিয়ে করল। ভিভিয়ানের ফ্ল্যাটে প্রথম রাত দুজনে জড়াজড়ি করে কাটিয়ে দিল। ভেলভেটের মতো জিভ, সোনালি চুল এবং গোপন গভীরে এক ভিজে, স্পন্দিত কামনার দাবি, অ্যালেকের জীবন দর্শন পাল্টে দিল।

অ্যালেক লাজুক। তার চেহারা মোটা। ভিভিয়ান এই নিয়ে কত মজা করে। সে রাগ করে না। বরং খুশি হয়। পার্টিতে ভিভিয়ানকে ঘিরে পুরুষদের ভিড়। অ্যালেক গর্ব ও ঈর্ষা রোধ করে। ওদের কতজন যে ভিভিয়ানের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে, তা অ্যালেক জানে না।

অ্যালেক ব্যারন পার্লামেন্টের সদস্য। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। ধনী ও অভিজাত রফ পরিবারের সন্তান। রফ অ্যান্ড সন্স-এর বোর্ড অফ ডাইরেক্টরদের সদস্য।

ভিভিয়ান অশিক্ষিত, দুশ্চরিত্রা, মন অগভীর। তার বাবা-মা, মিউজিক দলের সঙ্গে যুক্ত আর্টিস্ট। অথচ ওই মেয়েকেই স্যার অ্যালেক নিকলস বিয়ে করল। গ্লাউসেস্টারশায়ারের পুরোনো বাড়িতে নিয়ে এল।

জর্জিয়ান স্থাপত্য, ডোরিক স্তম্ভ, হাজার একর বিস্তৃত ফার্ম, কাছেই নদীতে মাছ ধরা যায়, বাড়ির পেছনে আছে পার্ক আর বন, চাইলে শিকার করা যায়।

ভেতরে পাথরের মেঝে, কাঠের দেওয়াল রং করা, শ্বেত পাথরের টেবিল, পুরোনো ঝাড়লণ্ঠন, মেহগিনির চেয়ার, লাইব্রেরিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর বুক কেস, হেনরি হল্যান্ডের ডিজাইন করা টেবিল, আছে টমাস হোপের ডিজাইন করা চেয়ার। ড্রেসিংরুমের মেঝেতে উইলটন কার্পেট, ছাদ থেকে ওয়াটারফোর্ড কাঁচের ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে। মস্ত বড়ো ডাইনিং রুম। চল্লিশ জন অতিথি একসঙ্গে বসতে পারে। ছটা বেডরুম দোতলায়। তিনতলায় চাকরদের থাকার ঘর।

ছ সপ্তাহ এখানে কেটে গেল তাদের।

একদিন ভিভিয়ান বলল–অ্যালেক, চলো আমরা লন্ডনে চলে যাই। এখানে আর নয়।

–কেন ভিভিয়ান! এত সুন্দর শান্তিপূর্ণ

–না, এসব আমার সহ্য হয় না।

অতএব লন্ডনের নাইটসব্রিজে এল তারা। মস্ত বড়ো চারতলা বাড়ি। সব কিছু আছে ড্রয়িং রুম, পড়ার ঘর, মস্ত বড়ো ডাইনিং রুম, ওপর তলায় একটা বড়ো আর চারটে ছোটো বেডরুম। আর আছে ঝরনা, স্ট্যাচু, সুন্দর বাগান, সেখানে সাদা বেঞ্চ আছে।

স্যার অ্যালেক আর ভিভিয়ান দুসপ্তাহ বড়ো বেডরুমে পাশাপাশি শুয়ে রাত কাটাল।

একদিন ভিভিয়ান বলল–অ্যালেক, তুমি কাল থেকে অন্য ঘরে শোবে। তোমাকে আমি ভালোবাসি ঠিকই, কিন্তু তোমার নাক ডাকাকে নয়। কিছু মনে কোরো না সোনা।

ভিভিয়ানের নরম তপ্ত শরীর অ্যালেকের ভালো লাগে। কিন্তু ভিভিয়ানকে যৌনতৃপ্তি দিতে অক্ষম সে। সে বুঝতে পারল, ভিভিয়ান সেজন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

সেদিন থেকে ভিভিয়ান বড়ো বেডরুমে আর স্যার অ্যালেক ছোটো বেডরুমে আশ্রয় নিল।

হাউস অফ কমনস-এ স্যার অ্যালেক বক্তৃতা দিচ্ছে। ভিভিয়ান ভিজিটর্স গ্যালারিতে বসে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বক্তৃতা শুনছে। দৃশ্যটা দেখে সুন্দরী বউয়ের প্রতি স্যার অ্যালেকের অন্তর গর্বে ভরে যেত। একদিন লক্ষ করল, ভিভিয়ান চেয়ারে বসে নেই।

নিজের বন্ধুরা ভিভিয়ানের চেয়ে বয়সে বড়। ওদের সঙ্গ ভালো নাও লাগাতে পারে ভিভিয়ানের। একথা চিন্তা করে স্যার অ্যালেক বউকে বলল, যুবক সঙ্গীদের বাড়িতে নিয়ে আসতে। এতেই বাধল কেলেঙ্কারি।

অ্যালেক নিজেকে বোঝাতো, ভিভিয়ানের বয়স কম, চঞ্চলতা তো থাকবেই। সন্তান হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু কার সঙ্গে শুয়ে যে ভিভিয়ান যৌন ব্যাধি বাধাল, তা স্যার অ্যালেক জানে না। শেষ পর্যন্ত অপারেশন হল। ভিভিয়ানের জরায়ু বাদ গেল। সন্তান লাভের আশাটুকুও বিনষ্ট হল।

অ্যালেকের মন খারাপ। ভিভিয়ানের কোনো দুঃখ নেই। সে উল্টে বলল–ডার্লিং, মন খারাপ কোরো না। নার্সারিটা কাটা গেলে কী হবে, খেলার জায়গাটা তো আছে।

ভিভিয়ানের চাহিদা প্রচুর। নিত্যনতুন দামি পোশাক, গয়না, গাড়ি তার চাই। অত টাকা অ্যালেক কোথায় পাবে? তাছাড়া রফ অ্যান্ড সন্সের শেয়ার বাইরে বিক্রি করাও যাবে না। কিন্তু, ভিভিয়ান কোনো কথা বুঝতে চায় না।

জুয়ার আড্ডায় যায় ভিভিয়ান। অ্যালেক জানতে পারল, জুয়ায় হেরে গিয়ে ভিভিয়ান এক হাজার পাউন্ড দেনায় পড়েছে। অ্যালেক দেনা শোধ করে দিল। বউকে নিষেধ করল উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতে।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! একমাসের মধ্যে সে আবার জুয়ায় আচ্ছায় পাঁচশ হাজার পাউন্ড দেনা করল। সপ্তাহে শতকরা দশ পাউন্ড সুদ। টড ক্লাবের টড মাইকেলসের পোষা গুণ্ডারা বারবার ধার শোধের জন্য চাপ দিচ্ছে।

জোন সুইনটন তাদেরই একজন। যার সামনে একই টেবিলে এই মুহূর্তে বসে আছে স্যার আলেক।

–যা ধার হয়েছিল, সুদে তো তার থেকে বেশি দিয়েছি।

–তাতে কী হয়েছে? ধার তো শোধ হয়নি।

–এ কী মগের মুলুক।

–তবে বসকে গিয়ে বলি।

–আরে বসো, বসো।

–এসব বাজে কথা একবারও বলবেন না। এসব কথা যারা বলে তাদের পায়ের হাঁটু পেরেক দিয়ে মেঝেতে গেঁথে ফেলা হয়। ক্রে ব্রাদার্স এই শাস্তিই ঠিক করেছে।

সত্যি বলছি, আমার অত টাকা নেই।

–কেন রফ অ্যান্ড সন্সের শেয়ার-এ আছে, ওগুলো বেচে তো–

সম্ভব নয়। বিক্রি করা বা দেওয়া কোনোটাই যাবে না। কোম্পানিটা যদি পাবলিক ফার্ম হত, তাহলে দেখা যেত।

কবে হবে পাবলিক কোম্পানি?

স্যাম রফকে তোবোঝাচ্ছি।

–ভালো করে বোঝাও।

মিস্টার মাইকেলসকে বলো, তার টাকা মার যাবে না কিন্তু আমার পেছনে এভাবে

-পেছনে? যদি সত্যিই আমরা তোমার পেছনে লাগি তাহলে তোমার ঘোড়া আস্তাবল, বাড়ি, এমনকি তোমার বউও বাদ যাবে না। সব পুড়ে মরবে।

প্লিজ, শান্ত হও।

–আরে, আমি মজা করছি। টড মাইকেলস তোমার বন্ধু। বন্ধু বন্ধুকে সাহায্য করে, তুমি তো জানো। তুমি যদি বসের একটা কাজ করে দাও, তাহলে দেনা মুক্ত হয়ে যাবে। বস বলেছে।

কী কাজ?

–পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশে তোমাদের ওষুধ কোম্পানি আছে। ওষুধের সঙ্গে কোকেন পাচার করতে পারো।

–তুমি কি পাগল হলে?

প্রস্তাবটা দিলাম, ভেবে দেখো। কোকেন পাচার, নতুবা দেনা শোধ। ভিভিয়ানকে আমার শুভেচ্ছা জানিও। শুভরাত্রি।

সুইনটন চলে গেল। স্যার অ্যালেক একা বসে আছে তার অত্যন্ত পরিচিত ও আরামদায়ক পরিবেশের মধ্যে। অ্যালেক ভাবতে থাকে। সে গুণ্ডাদের ফাঁদে পড়েছে। অসভ্য, অভদ্র, গুণ্ডা। নীচুতলার মানুষ। এদের কেন সে নিজের জীবনে আসতে দিল? ওসব টাকা-ফাঁকা কিছু নয়। ওদের আসল উদ্দেশ্য হল অ্যালেককে শিখন্ডী করে ওরা ওষুধের সঙ্গে কোকেন পাচার করতে চাইছে। যদি ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায় যে, গুণ্ডা মস্তানদের সঙ্গে তার আঁতাত আছে, তাহলে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা ব্যাপারটা নিয়ে জলঘোলা করবে। সে সরকার পক্ষের সদস্য। তাকে সদস্যপদ ত্যাগ করার জন্য চাপ দিবে। এমনকি শিলটারন হানড্রেডস পদে যোগদানের জন্য চাপ সৃষ্টি করাও হতে পারে। তার মানে বছরে সে মাত্র একশো পাউন্ড মাইনে পাবে! পার্লামেন্টের সদস্য হওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে চিরদিনের জন্য। কারণটা গোপন রাখা হলেও স্যার অ্যালেককে অপমানিত হতে হবে। যদি না সে গুণ্ডাদের টাকা ফেরত দিতে পারে।

কোম্পানিকে পাবলিক কোম্পানি করার জন্য বারবার স্যাম রফকে বলেছে সে।

স্যাম রফ তার কথায় কান দেয়নি। সে বলেছে- পাবলিক কোম্পানি কাকে বলে জানো? পরিবারের বাইরের লোকেরা আমাদের অর্ডার দেবে, কীভাবে ওষুধ কোম্পানি চালাতে হবে। শেষ পর্যন্ত ওদের হাতেই সব কিছু চলে যাবে। তোমার এত টাকার কীসের প্রয়োজন জানি না! মাইনে তো ভালোই পাও। তাছাড়া তোমার এক্সপেনস অ্যাকাউন্টস আছে। তাহলে?

অ্যালেক ভাবল, টাকার প্রয়োজনের কথাটা স্যামকে বুঝিয়ে বলবে। পরক্ষণেই তার মনে হল, না, বলে কিছু লাভ নেই। স্যাম কাঠখোট্টা মানুষ। ব্যবসা ছাড়া কিছু বোঝে না। উল্টে অ্যালেককে চাকরি থেকে বরখাস্ত করবে।

অতএব স্যার অ্যালেক এখন সত্যিই ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে।

***

হোয়াইটস ক্লাবের রিসেপশন পোর্টার এগিয়ে এল, পেছনে একজন পিওন।

-স্যার অ্যালেক, বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। পিওন চিঠি দিতে এসেছে। এটা নাকি দারুণ জরুরি।

পিওন একটা সীল করা বড় খাম অ্যালেকের হাতে তুলে দিল।

-ধন্যবাদ, স্যার অ্যালেক।

অ্যালেক খামটি হাতে নিয়ে বসে রইল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর খামটা ছিঁড়ে ফেলল– স্যাম রফ মারা গেছে!–

চিঠিটা হাতের মুঠোয় নিয়ে অ্যালেক বসে রইল। চোখে জল।

.

০৬.

নিউইয়র্ক। সোমবার, ৭ই সেপ্টেম্বর। বেলা ১১টা।

কেনেডি এয়ারপোর্ট। প্রাইভেট বোয়িং ৭০৭-৩২০ নামল। এই প্লেনে অনেকবার রিস উইলিয়ামস আসা-যাওয়া করেছে। সঙ্গে ছিল স্যাম রফ। কিন্তু আজ সে নেই। তার অস্তিত্ব টের পায় রিস।

ছোট্ট লাগেজ। কাস্টমসে দেরি হল না। বাইরে বেরিয়ে এল রিস্। ধূসর আকাশ। বাতাসে শীতের পূর্বাভাস। লিমুজিন গাড়ি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িতে উঠে বসল সে। এলিজাবেথকে কী বলবে ভেবে নিল। লং আইল্যান্ড এস্টেটে গাড়ি এসে থামল। স্যাম রফের বাড়ি।

এলিজাবেথ দরজা খুলে দিল।

সুন্দরী এলিজাবেথ, মায়ের মতোই। মধ্যরাতের মতো কালো দুটি চোখ, ভারী আঁখি পল্লব। ফর্সা। তার পরনে গলাখোলা ক্রিম রঙের সিল্কের ব্লাউজ, ধূসর ফ্লানেলের স্কার্ট পরেছে।

রিস্ তাকিয়ে থাকে। ন বছর আগে দেখা সেই লাজুক মেয়েটি আজ পূর্ণ যুবতী।

–এসো রিস, বাবা এল না।

সাজানো কথাটা হারিয়ে গেছে। রিস বলল তোমার বাবার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।

এলিজাবেথের মুখ বিবর্ণ।

–স্যাম মারা গেছে।

এলিজাবেথ নীরব। খানিক বাদে বলে কী করে?

পাহাড়ে উঠতে গিয়ে দড়ি ছিঁড়ে পড়ে যায় অতল গহ্বরে।

–মৃতদেহ?

খাদের অতল গভীরে...

–বাবা খুব ভালো অ্যাথলিট ছিল।...

ঘোরের মধ্যে বলে চলেছে এলিজাবেথ। চোখের মণি স্থির। বরং অস্বাভাবিক উজ্জ্বল।

...স্যাম আগেও পাহাড়ে চড়েছে।

ডাক্তার ডাকব, ওষুধ খেলে মনটা হয়তো–

না, আমি ঠিক আছি রিস। এখন শুতে যাব।

–আমি কি থাকব?

ধন্যবাদ, প্রয়োজন নেই। রিস্ গাড়িতে উঠে বসল। লিজ হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে বলল– তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, রি। জেসাস ক্রাইস্ট।

***

রিস্ উইলিয়ামস চলে গেছে। বিছানায় শুয়ে আছে এলিজাবেথ রফ। সিলিং-এর দিকে দৃষ্টি। সেপ্টেম্বরের সূর্যের মলিন আলো এসে পড়েছে সেখানে, বিচিত্র নক্সার খেলা।

তারপরেই শুরু হল যন্ত্রণা। সেই সঙ্গে চলল হাসি-কান্না। যেন হিস্টিরিয়া রোগী। মাঝরাতে উঠে সে খেল। বমি করল। ভোর হল। ফোন এল। স্যাম! না, বাবা তো নেই।

বাবা তার হারিয়ে গেছে চিরদিনের মতো অতল গহ্বরে আর কোনোদিন তাকে । কাছে পাবে না অতীতের স্মৃতি এসে হানা দেয় লিজের মনে।

.

০৭.

এলিজাবেথ রোয়ানে রফের জন্মইতিহাস অত্যন্ত দুঃখজনক। দুভাবে। ডেলিভারি টেবিলে মারা গেল তার মা। এর থেকে বড়ো অঘটন হল, সে ছেলে নয়, মেয়ে।

মাল্টিবিলিয়ন ডলার মাল্টিন্যাশনাল রফ অ্যান্ড সন্স ছেলের জন্য, উত্তরাধিকারীর জন্য অপেক্ষা করেছে, গত ন মাস।

প্যাট্রিসিয়া। স্যাম রফের বউ। অসাধারণ সুন্দরী। স্যাম রফের টাকা আর নামডাকের জন্য অনেক মেয়েই তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু স্যাম প্যাট্রিসিয়াকেই বিয়ে করেছিল, কারণ সে ভালোবাসতে জানে। অবশ্য স্যাম ভালোবাসার তোয়াক্কা করে না। রফ অ্যান্ড সন্সই তার জীবনের ধ্যানজ্ঞান। তবে প্যাট্রিসিয়া সুন্দরী বলে স্যামের কাছে গুরুত্ব পেত। মানে বউয়ের সৌন্দর্যকেই সে বেশি গুরুত্ব দিত।

রফ অ্যান্ড সন্স নামের আন্তর্জাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার, প্রাণপুরুষ স্যাম রফ। যদিও স্যাম প্যাট্রিসিয়াকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল। প্যাট্রিসিয়ার কাজ ছিল অতিথি অ্যাপায়ন করা। চেহারা সুন্দর রাখার জন্য তদারকি করা। তাকে নিয়মিত ডায়েটিং করতে হত। স্যাম চাইত, তার বউ হবে গ্ল্যামার কুইন। তার জন্য আনা হত সেরা পোশাক নির্মাতাদের তৈরি পোশাক লন্ডন, প্যারী, নিউইয়র্ক, ডাবলিন থেকে। সে জাঁ শ্লীমবার্গার ও বুলগারির তৈরি অলংকার ব্যবহার করত। তার জীবন ছিল ব্যস্ততায় ভরা, কিন্তু শূন্য ও নিরানন্দ।

অবশেষে প্যাট্রিসিয়া গর্ভবতী হল। রফ পরিবারের শেষ পুরুষ উত্তরাধিকারী স্যাম রফ। তাই শুরু হল প্রতীক্ষার পালা। ছেলে সন্তান চাই। প্যাট্রিসিয়াকে রানির মতো সেবাযত্নে রাখা হল।

নমাস পর প্যাট্রিসিয়াকে ডেলিভারিরুমে নিয়ে যাওয়া হল। স্যাম তার শুভ কামনা করল। কেটে গেল তিরিশ মিনিট। দুর্ভাগ্য, কন্যাসন্তান প্রসব করল এবং শিরায় রক্ত জমাট বেঁধে মারা গেল। স্বামীর আশা পূরণ সে করতে পারেনি, বেচারি এই দুঃসংবাদ জানবার অবকাশ পর্যন্ত পেল না।

প্যাট্রিসিয়ার মৃতদেহ কবর দেওয়া হল। ছোট্ট মেয়ের দেখাশোনার জন্য আয়া রাখা হল। বিভিন্ন আয়ার তত্ত্বাবধানে এলিজাবেথের শৈশবের পাঁচটা বছর কেটে গেল। বাবাকে খুব বেশি কাছে পেত না সে।

আজ লং আইল্যান্ড বোলিং-এর মাঠ, টেনিস কোর্ট, সুইমিং পুল এবং স্কোয়াশ খেলার কোর্টে আছে; কাল বিয়ারিজ-এর ভিলায় আয়ার সঙ্গে, প্লেনে করে। এখানে তিরিশ একর জমি আর পঞ্চাশটা ঘর আছে। লিজ সেখানে একা একা ঘুরে বেড়াত। আপন মনে থাকত। কখনও সে গেছে বীকম্যান প্লে-র সেই মস্ত বড়ড়া বাড়িতে, অথবা সার্ডিনিয়ার কোস্টা স্পোরিলডার সমুদ্র উপকূলের সেই সুন্দর ভিলায়। লিজের মনে হত, সে যেন এক অজানা অচেনা পুরীতে ভুল করে ঢুকে পড়েছে।

ছোট্ট লিজ ছবি আঁকত, অ্যাশট্রে তৈরি করত, সবই বাবাকে দেখাবে বলে। বাবা একপলক দেখে নিয়ে বলত–তুমি কখনোই আর্টিস্ট হতে পারবে না, তাই না?

মধ্যরাত। পাচানো সিঁড়ি বেয়ে লিজ চলে এসেছে বাবার পড়ার ঘরে। লিজের কাছে এটা এক পবিত্র জায়গা। এখানে বসে তার বাবা পড়াশোনা করে। কাগজপত্র সই করে, পৃথিবী শাসন করে। কল্পনায় সে বাবার সঙ্গে কথা বলে।

অন্ধকার রাত। লিজ ডেস্কে একা বসে আছে। বাবা সস্নেহে তাকে কোলে তুলে নেয়। শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়। রিসেপশন হলে প্যাট্রিসিয়ার ছবি। লিজ তাকিয়ে থাকে। কী সুন্দর! আর সে? বিশ্রী, বাবা তাই তাকে পছন্দ করে না।

লিজের বয়স বারো। ম্যানহাটানের পূর্ব দিকে একটা প্রাইভেট স্কুলে তাকে ভর্তি করে দেওয়া হল। বছর ঘুরে গেল। কিন্তু এলিজাবেথ রফের পড়াশোনায় কোনো উন্নতি দেখা গেল না। রিপোর্ট এল স্কুল থেকে একা একা থাকতে ভালোবাসে, বন্ধুবান্ধব পছন্দ করে না, পড়াশোনায় ভালো নয়, উন্নতির কোনো চেষ্টা নেই। ওর বাবা ওই স্কুলের পেট্রন। নয়তো স্কুল থেকে ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হত।

বাস্তব রিপোর্টের আড়ালে আছে এলিজাবেথের কল্পনাপ্রবণ মন। সে একা থাকতে চায়, সহজে কথা বলে না কারো সাথে। জবাব জানা, অথচ মুখ খুলবে না। রোলস রয়েসে চেপে স্কুলে যেতে তার ভীষণ লজ্জা।

স্বপ্নে ভেসে ওঠে তার বাবার মুখ। প্যারীতে ঘোড়ার গাড়িতে তারা দুজন। সুইজারল্যান্ডে তারা বাবা আর মেয়ে স্কি করছে। বাবার পা ভেঙে গেছে। বাবার সেবা করছে সে। কোথা থেকে মৃত মা জ্যান্ত হয়ে ঘরে এসে ঢুকল। বাবা মাকে চলে যেতে বলল–আমি এখন। এলিজাবেথের সঙ্গে কথা বলছি।

আবার সে স্বপ্নে দেখে, সার্ডিনিয়ার সেই সুন্দর ভিলা। লিজ রান্না করেছে। বাবা ডিনারে বসে বলল এলিজাবেথ, তোমার রান্নার হাত খুব ভালো। তোমার মায়ের থেকেও।

দীঘল চেহারার কোনো যুবক এলিজাবেথকে বিয়ে করতে চাইছে। তার বাবা বলে উঠল নানা, এলিজাবেথ, আমাকে ছেড়ে যেও না। প্লিজ।

না, এলিজাবেথ তার বাবাকে ছেড়ে কখনও যাবে না।

ইতালীর সমুদ্র উপকূল। ১৬০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে পাহাড় আর সমুদ্র ঘেরা এক দ্বীপ। বাবার এই ভিলাটা এলিজাবেথের মনের মতো। আদিম সাগরের গভীর থেকে আদিম আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে লাভার স্রোত ছড়িয়ে পড়ে সৃষ্টি করেছে এই দ্বীপ। চারদিকে পাহাড় আর সমুদ্রের নীল জলরাশি। হাওয়ায় সমুদ্রের গন্ধ। মাশিয়া ফুলের সুবাস। সম্রাট নেপোলিয়ানের প্রিয় এই সাদা আর হলুদ ফুল। করবেকোলার ঝোঁপ, প্রায় দুফুট উঁচু। সেখান থেকে স্ট্রবেরির মতো লাল ফল ঝুলছে। ওক গাছ পাথুরে ও প্রকাণ্ড। এই গাছের ছাল দিয়ে মদের বোতলের ছিপি তৈরি হয়। বড়ো বড়ো পাথরে অদ্ভুত গোছের গর্ত। সেই গর্তে হাওয়া ঢুকে এক মিষ্টি সুরের সৃষ্টি করে। যেন পাহাড় গান গাইছে। ঝড় বইলে অন্য শব্দ। যেন অসুখী আত্মার কান্না। কখনও হাল্কা হাওয়া বয়। কখনও আবার সাহারা মরুভূমি থেকে ছুটে আসে ভয়ংকর গরম হাওয়া।

পোর্টো কার্ভোয় সমুদ্রের তীরে পাহাড়ের মাথায় রফভিলা। সেখানে জুনিফার ঝোঁপ আছে। সার্ডিনিয়ার বুনো জলপাইয়ের তিতো ফল। নীচে বন্দর চোখে পড়ে, চোখে পড়ে পাথুরে ঘরবাড়ি, সবুজ গাছপালা যেন বাচ্চা ছেলের হাতে আঁকা রং-বেরঙের ক্রেয়ন

ভিলাটি পাথরের। আছে ফায়ার প্লেস ও ঝুলবারান্দা। লিভিংরুম ও ডাইনিং রুমে দাঁড়ালে বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য নজরে পড়ে। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে আসবাবপত্রগুলি। রুক্ষ কাঠের টেবিল, বেঞ্চি, নরম ইজিচেয়ার। জানালায় ঝুলছে সাদা পশমের পর্দা, হাতে বোনা। মেঝেতে সার্ডিনিয়ার টিলা রং-বেরঙের। ওপর তলায় চারটে বেডরুম। সেখানে শোভা পাচ্ছে স্থানীয়, ইতালিয়ান এবং আদিম সার্ডিনিয়ার শিল্পকলা। হলঘরে রয়েছে রফ অ্যান্ড সন্স নামের ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা স্যামুয়েল রফ ও তার স্ত্রী টেরেনিয়া রফের পোর্ট্রেট।

টাওয়ার রুম, ঢালু টালির ছাদের নীচে। তেতলা থেকে সরু সিঁড়ি ওদিকে উঠে গেছে। দেয়ালে বুককেস ও ম্যাপ। ঘরের ভেতরে আছে বিরাট বড়ো ডেস্ক আর নরম সুইভেল চেয়ার। জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়।

তখন এলিজাবেথ তেরো বছরের কিশোরী। জানতে পারল অনেক কিছু। নিজের পরিবার সম্পর্কে। নিজের কাছে নিজের গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে গেল।

***

টাওয়ার রুমের বুককেসে বিভিন্ন ধরনের বই। ফার্মাকোলজি, আন্তর্জাতিক আইন ও মাল্টিন্যাশনাল করপোরেশন সংক্রান্ত বইয়ের সংখ্যা বেশি। কাঁচের শেলফে কতগুলি দুষ্প্রাপ্য বইও রয়েছে চিকিৎসা সংক্রান্ত। লাতিন ভাষায় লেখা-সারকাইনস্ট্যানস এবং অন্য বইটি মেটিরিয়া মেডিকা। এলিজাবেথ লাতিন জানে। তাই সে একটা বই টেনে নিল। পিছনে নজরে পড়ল আর একটি পুঁথি। একশো বছর বা তার বেশি পুরোনো হবে। পাতাগুলো হলদেটে হয়ে গেছে। ইংরাজি ভাষায় লেখা। লেখকের নাম সে খুঁজে পেল না। এটা ছিল আত্মজীবনী এলিজাবেথের পূর্বপুরুষ এবং রফ অ্যান্ড সন্স-এর প্রতিষ্ঠাতা স্যামুয়েল রফের জীবনকাহিনী।

লিজ দেখে স্যামুয়েল ও তার বউ টেরিনিয়াকে। অবশ্য ছবিতে। তাদের পরনে পুরোনো ফ্যাশানের পোশাক। সাদা চুলের স্যামুয়েলের গালের হাড় উঁচু, চোখে নীলের উজ্জ্বলতা, বুদ্ধিদীপ্ত মুখ ও শক্তিশালী চেহারা তাকে আরও সুন্দর করে তুলেছে। টেরিনিয়া সুন্দরী। পরনে সাদা সিল্কের পোশাক, ব্রোকেডের বডিজ, কালো চুল ও চোখ।

টাওয়ার রুমে বসে এলিজাবেথ বইটার পাতা ওল্টাতে থাকে। ধীরে ধীরে মৃত স্যামুয়েল ও টেরিনিয়া রফ জীবন্ত হয়ে ওঠে তার চোখের সামনে।

সময়টা ১৮৫৫। ইহুদি বিদ্বেষীরা তাদের ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। স্যামুয়েল রফ ইহুদি, রোমান্টিক, অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় এবং খুনি–

২. স্যামুয়েল রফের জীবনকাহিনী

০৮.

স্যামুয়েল রফের জীবনকাহিনী

সময় ১৮৫৫।

ইহুদি-বিদ্বেষী জনতা ইহুদিদের বস্তিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।

যুগ যুগ ধরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রচার চলেছে- ইহুদিদের হত্যা করো। ইওরোপের প্রতিটি দেশ, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, পশ্চিম ও পূর্ব ইওরোপ এবং রাশিয়ার খ্রিস্টান পাদ্রিরাও এই হত্যাকাণ্ডে সামিল হয়েছে।

কিন্তু কেন? কী অপরাধ ওদের?

দোষ করেছে ওদের পূর্বপুরুষ। যিশুকে ওরা পরিত্রাতা বা ঈশ্বরের পুত্ররূপে গণ্য করেনি। ওরা তাকে ক্রশ বিদ্ধ করে হত্যা করেছে। তাই বদলা নিতে হবে।

ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বলে আসছে ইহুদিদের হত্যা করো। দাঙ্গা লাগাও। ওদের খুন করো।

সেক্সপিয়ার বলেছেন–ইহুদি শাইলক এক নির্মম জল্লাদ। সে সুদখোর শয়তান। সে বলে, টাকা নাও, মানুষের মাংস দাও।

ইহুদিদের খুন করো–ওরা সুদখোর, নোংরা বজ্জাত, স্পাই, মাথায় বুদ্ধি গিজগিজ করছে। ওরা নিজেদের ধার্মিক মনে করে। ওরা কারো সঙ্গে মিশতে চায় না। অর্থাৎ বেশি মাত্রায় সংবেদনশীল।

সবাই ওদের হত্যা করতে বলেছে। সবাই–পাদ্রি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, রাজা, পত্রিকা। বলেছে হিটলার, মুসোলিনি, গোয়েবেলস, হিমলার।

–ওদের হত্যা করো!

মিশরের আরব জাতীয়তাবাদী এবং সৌদি আরবের শেখ বলেছে ওরা মুসলমান নয়। ওদের তাই হত্যা করো।

এবং ওই বছর ক্রাকোর ইহুদি বস্তিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে চলল ইহুদি নিধন যজ্ঞ। ওরা পুড়ছে, মরছে, বাঁচছে, কাঁদছে। স্যামুয়েল রফ তখন পাঁচ বছরের। মৃত্যুভয়ে গিয়ে লুকিয়েছিল কয়লার কুঠুরিতে। একসময় দাঙ্গা থামল। সে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। ঘেটোর রাস্তা। তখনও কাঠের বাড়িগুলো পুড়ছে, ধোঁয়া উঠছে। চারপাশ লালে লাল। যারা বেঁচে ছিল তারা তাদের নিকটজনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আগুন নেভাবার চেষ্টা করছে। তারা গরিব। তারা ধনী নয়, তারা শাইলক নয়। আছে সামান্য কিছু। ব্যবসা ও ঘরবাড়ি। তবু তাদের মরতে হবে। কারণ তারা ইহুদি।

ফ্রায়ার ব্রিগেড এল না। ওরা ইহুদিদের ঘরের আগুন নেভাতে আসে না। খ্রিস্টানদের দাস ওরা।

ইহুদিরাই ছুটে এসেছে। কুয়ো থেকে বালতি বালতি জল ভোলা হচ্ছে। আগুন নেভানোর চেষ্টা। পড়ে আছে মৃত মানুষ। কেউ বা আধপোড়া হয়ে বেঁচে আছে তখনও। বীভৎস চিত্র উলঙ্গ, ধর্ষিতা, কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়া। ছোটো ছেলেমেয়েরাও আগুনের হাত থেকে রেহাই পায়নি। তারা কাঁদছে। শোনা যায় আর্ত আবেদন। চাই সাহায্য।

স্যামুয়েল থমকে দাঁড়াল। মা পড়ে আছে রাস্তার ওপর। রক্তে মুখ ঢেকে গেছে। হাঁটু ভাজ করে বসে পড়ল সে।

মা–

চোখ খুলল। কিছু বলার চেষ্টা করল।

স্যামুয়েল জানে, তার মা আর বাঁচবে না। তবু তাকে চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু কীভাবে? তার কতখানি শক্তি? সে পরম যত্নে মায়ের রক্ত মুছে দিল। খানিক বাদেই সব শেষ।

মাকে কবর দিল সে। ইহুদি শাস্ত্রানুসারে শবের নীচের মাটিও কবরের নীচে চাপা দিতে হল।

ছোট্ট স্যামুয়েল চোয়াল শক্ত করে প্রতিজ্ঞা করল-যেভাবেই হোক। সে ডাক্তার হবে।

***

স্যামুয়েলদের বাড়িতে রফ বংশের আটটা পরিবার থাকে। তিনতলা সরু কাঠের বাড়ি। ছোট্ট একটা ঘরে থাকে স্যামুয়েল আর তার বাবা ও পিসি। সে একা থাকতে ভালোবাসে না। যেখানে হৈ-চৈ মানুষের ভিড় সেখানেই স্যামুয়েল।

সন্ধ্যা হলেই ইহুদিদের বস্তিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তারপর গেটে মস্ত বড়ো তালা দিয়ে দেয় খ্রিস্টানরা। সকালে চাবি খুলে দেয়। ইহুদিরা পিলপিল করে খ্রিস্টানদের শহরে ঢুকে পড়ে। সন্ধ্যার আগেই শহর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হয়, নতুবা সেদিনের মতো বস্তিতে ফেরার পথ বন্ধ।

স্যামুয়েলের বাবা গাড়ি ঠেলে ঠেলে বাসন বিক্রি করে। ভাঙা শিরদাঁড়া নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, ধূসর চুল। মুখে ক্লান্তির ছাপ। মুখের চামড়া কোঁচকানো। রাশিয়ার কিয়েভ শহরে আগে থাকত। বাবা ইহুদিনিধন যজ্ঞের সময় পালিয়ে আসে এখানে।

রাস্তা দিয়ে চলেছে স্যামুয়েল। কত কিছু বিক্রি হচ্ছে! রাস্তার দুধারে ফেরিওয়ালাদের ভিড়। লিনেন ও লেস কাপড়, সুতো, চামড়া ও মাংস, সঁচ, সাবান, মোমবাতি, বোম, সিরাপ, জুতো, মুরগির মাংস কত কী। বাতাসে ভাসছে সদ্য সেঁকা রুটি, শুকনো মাছ, পানীয় ফল, কাঠের গুড়ো আর চামড়ার গন্ধ। স্যামুয়েল নাক টেনে ঘ্রাণ নেয়।

তখন তার মাত্র বারো বছর বয়স। খ্রিস্টানদের শহরে সে প্রথম পা রেখেছিল, সঙ্গে ছিল বাবা। ভোর হতে না হতেই ইহুদিরা ঠেলা নিয়ে বন্ধ দরজার সামনে এসে ভিড় করে। স্যামুয়েলের পরনে ভেড়ার লোমের পাতলা কোট। তবুও ঠান্ডা শীতালী হাওয়ায় কাঁপছে সে।

কখন গেট খুলবে, সেই প্রত্যাশায় সবাই অপেক্ষা করছে। পুব আকাশে কমলা রঙের সূর্য দেখা দিল। কাঠের বিশাল দরজা খুলে গেল। পিলপিল করে সবাই ঢুকে পড়ল ভেতরে।

ইহুদিদের ঘাতক খ্রিস্টানরা এখানে বাস করে। স্যামুয়েল ভয়ে ভয়ে পথ হাঁটছে। চার দিকে ওর নজর। ওদের দাড়ি নেই। লম্বা কালো কোট পরে। দেখে, চার্চ অফ সেন্ট মেরীর বিশাল গির্জা। দুটো মিনার আকাশের দিকে মাথা তুলে আছে। সকলের বাড়ির সামনে বাগান আছে। অবাক হয়ে স্যামুয়েল ভাবে, এখানকার লোকেরা নিশ্চয়ই খুব বোলোক।

প্রায় ছ-সাতটা দোকান ঘুরে তারা সওদা করল। ঠেলায় চাপিয়ে আবার তারা রওনা দিল। ফিরতে হবে।

স্যামুয়েলের ফিরে আসতে মন চায় না। বাবা জানালো, সন্ধের আগেই আমাদের এ শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে নয়তো গেট বন্ধ হয়ে যাবে।

ওহ, স্যামুয়েলের যদি ওই পরিচ্ছন্ন স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দপূর্ণ স্বাধীন পরিবেশে জন্ম হত। নাঃ তাকে এই পরাধীনতার হাত থেকে মুক্তি পেতেই হবে।

***

স্যামুয়েল রফ, গরিব ইহুদি বাবার ছেলে, উচ্চাশা ডাক্তার হবে।

স্যামুয়েল লক্ষ করেছে, ইহুদি বস্তিতে সংক্রামক রোগের প্রকোপ বড়ো বেশি। সেই তুলনায় এখানে ডাক্তারের সংখ্যা অত্যন্ত কম। মাত্র তিনজন ইহুদি ডাক্তার। এদের মধ্যে ডাক্তার জেনোওয়ালের পসার বেশি। বস্তির ছোটো ছোটো কুঁড়েঘরের মাঝখানে তার তিনতলা বড়ো বাড়ি। স্যামুয়েল হাঁ করে ওই বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে। সাদা লেসের ঝকঝকে পর্দা ঝুলছে জানালায়। পর্দার ফাঁকফোকর দিয়ে নজরে পড়ে আসবাবগুলি– ঝকঝকে চকচকে।

স্যামুয়েল ভাবে, যদি এরকম একজন ডাক্তারের সান্নিধ্য সে লাভ করতে পারত...কিন্তু গরিবের ছেলেকে কে পাত্তা দেবে?

স্যামুয়েল দেখল, একদিন ডক্টর জেনোওয়াল ও তার মেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। মেয়েটি তার বয়সী, কিন্তু অপূর্ব সুন্দরী। স্যামুয়েল মনে মনে উচ্চারণ করল আমি ওকে বিয়ে করব। কিন্তু কীভাবে? তা সে জানে না।

এরপর থেকে স্যামুয়েলের কাজ হল ডাক্তারের বাড়ির সামনে তীর্থের কাকের মতো দাঁড়িয়ে থাকা। ডাক্তারের মেয়েকে চোখের দেখা দেখবে একবার।

এক সন্ধ্যা। ভেতর থেকে পিয়ানোর সুর ভেসে আসছে। নিশ্চয়ই ডাক্তারের মেয়ে বাজাচ্ছে। আজ তাকে ওর সঙ্গে দেখা করতেই হবে। জানালায় উঠে দাঁড়াল সে, অতি সন্তর্পণে-সোনালি-সাদা রঙের পিয়ানো বাজাচ্ছে ডাক্তারের মেয়ে। আর ডাক্তার একটু দূরে আর্মচেয়ারে বসে বই পড়ছে।

স্যামুয়েল ওই মেয়েটাকে ভালোবাসে। কিন্তু মেয়েটাকে সে কথা জানাবে কী করে? বীরত্বপূর্ণ কিছু করে। জানালার রড ধরে সে তখন দিবাস্বপ্নে বিভোর। সে যে জানালার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, সেকথা বেমালুম ভুলে গেছে। একসময় টুক করে হাত ফসকে সে পড়ে গেল নীচে। দুটো আতঙ্কিত মুখ চিৎকার করে উঠল।

তাকে অপারেশন টেবিলে নিয়ে যাওয়া হল। জ্ঞান ফিরলে ডাক্তার জেনোওয়াল জানতে চাইলেন- তুমি ওখানে চুরি করতে গিয়েছিলে?

না।

–তোমার নাম কী?

–স্যামুয়েল রফ।

–তোমার মণিবন্ধের হাড় ভেঙে গিয়েছিল। অপারেশন করে সেটা সেট করে দেওয়া হয়েছে। আমি লক্ষ করেছি, তুমি আমার বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করো। কিন্তু কেন?

–আমি আপনার সাহায্য চাই। আমি ডাক্তার হব।

ডাক্তারের বিস্ফারিত দুটি চোখ।

স্যামুয়েল শোনান, তার উচ্চাশার কথা। মা মারা গেছে। অসহায় দর্শকের মতো সে মায়ের মৃত্যু দেখেছে। খ্রিস্টানরা তাদের পরাধীন করে রেখেছে। স্যামুয়েল স্বাধীন হতে চায়। সে ডাক্তারের মেয়েকে ভালোবাসে। তারপর সে বলল–স্যার, আমি দুঃখিত।

–আমিও দুঃখিত। আমরা সবাই বন্দি জীবনযাপন করছি। তুমি, আমি, আমরা সবাই। তোমার হাত ভেঙেছে ঠিকই, কিন্তু তার জন্য আমি দুঃখ পাইনি। সেটা ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তুমি স্বপ্ন দেখো। একটা নয়, দুটো। আমি তোমার স্বপ্নগুলোকে ভেঙে দেব, যা সারাতে পারবে না। প্রথমত, তুমি ডাক্তার হতে চাও, যা আমাদের দুনিয়ায় অসম্ভব। এখানে তিনজন বাদে অনেক শিক্ষিত ট্রেনড ডাক্তার আছেন, যারা খ্রিস্টানদের কাছ থেকে প্র্যাকটিস করার অনুমতি পায়নি। আমাদের তিনজনের মধ্যে একজন মরলে তাদেরই একজন ডাক্তার হওয়ার সুযোগ পাবে। অতএব, তুমি কোনোদিন ডাক্তার হতে পারবে না। এবার দ্বিতীয় স্বপ্নের কথা বলি। তোমার পরিবার, তোমার ঐতিহ্য, তোমার সামাজিক স্তর, কোনোটাই আমাদের সমান নয়। আমার মেয়ে টেরেনিয়ার পক্ষে তুমি অযোগ্য, উকিল ডাক্তার বা ইহুদি ধর্মপ্রচারক হবে তার স্বামী। ওর আশা তোমাকে ত্যাগ করতে হবে। আর হ্যাঁ, ব্যান্ডেজটা ময়লা কোরো না যেন। এখন চলি, স্যামুয়েল রফ।

***

স্যামুয়েল রফ কিন্তু হার মানেনি। সে পরের দিনই বিকেলে ডাক্তারের বাড়িতে এসেছে। ডাক্তার তাকে তাড়িয়ে দিতে পারেনি। সে ডাক্তারের ফাইফরমাস খাটে, তার বিনিময়ে ডাক্তার তাকে অপারেশনের সময় বা ওষুধ তৈরির সময় দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে দেয়। স্যামুয়েল দেখে আর মনে রাখে। ডাক্তার ভাবে, ছেলেটাকে শুধু শুধু আশা দিচ্ছি। অথচ ওকে চলে যেতেও বলতে পারি না।

একদিন টেরেনিয়ার আর স্যামুয়েলের চোখের মিলন হল।

সে রাতে স্যামুয়েল ঘুমোতে পারল না। সে স্বপ্ন দেখে–সে টেরেনিয়াকে বিয়ে করেছে, এই ঘিঞ্জি ইহুদি বস্তি, এই পরাধীনতা ছেড়ে সে চলে গেছে অন্য কোথাও। স্যামুয়েল টেরিনিয়াকে তার সাফল্যের অংশীদার করেছে।

.

এবং এই ঘটনার পর স্যামুয়েল ল্যাবোরেটারিতে বেশি সময় কাটাতে লাগল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করে মলম আর মিক্সচার তৈরি করল নিজের হাতে। অন্যদিকে রয়েছে। সুন্দরী টেরেনিয়া, তার ভালোমানুষ বাবা আর বজ্জাত মা। স্যামুয়েল ওই খাণ্ডারনি মহিলাকে সম্ভব মতো এড়িয়ে চলে।

বইয়ের পর বই পড়ছে স্যামুয়েল রফ।

খ্রিস্টের জন্মের ১৫৫০ বছর আগেকার কথা। প্রাচীন মিশরবাসীরা প্যাপিরাসের পাতায় ৮১১ টা প্রেসক্রিপশন লিখেছিল। তখন মানুষের আয়ু ছিল অত্যন্ত কম। স্যামুয়েল বুঝল, কেন মানুষ ওই সময় মাত্র পনেরো বছর বাঁচত। প্রেসক্রিপশনগুলো পড়ল সে। লেখা আছে কুমিরের মল, গিরগিটির মাংস, বাদুড়ের রক্ত, উটের থুথু, সিংহের যকৃৎ এবং ব্যাঙের পা।

কিন্তু আজ? আজ প্রেসক্রিপশনের ওপরে একটা R ও X লেখা হয়। তার মানে মিশরীয় দেবতা হোরীর উদ্দেশে প্রার্থনা জানানো হয়।

মিশরের প্রাচীন নাম কেমি বা কাহমি। এর থেকেই কেমিস্ট্রি শব্দটির উৎপত্তি। প্রথম কেমিস্ট ও প্রথম চিকিৎসক হলেন প্রাচীনকালের ধর্মযাজকরা।

ফার্মেসির বোতলে বা শিশিতে ভরা থাকে ক্যাস্টর অয়েল, আয়োডিন, কোডিন, ইপিকাক, ক্যালোমেল, রুবাব। হুপিং কাশি, টাইফয়েড হলে এই সব ওষুধ দেওয়া হত। যদিও রোগীর অসুখ সারাতে পারত না। মলমে পাওয়া যেত মরা পোকা আর গার্গল করার ওষুধে মিলত ইঁদুর নাদি। অসুখে নয়তো ওষুধের বিষক্রিয়ার মৃত্যু ঘটত রোগীর।

প্রত্যেক রোগের যথাযথ চিকিৎসা থাকা প্রয়োজন। স্যামুয়েলের দৃঢ় বিশ্বাস, স্বাস্থ্যই স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিক হল রোগ।

হবে হয়তো। ডাক্তার বলতে থাকে, তবে আমার রোগীরা চট করে নতুন ওষুধ ব্যবহার করতে নারাজ।

ডাক্তার ওয়ালের লাইব্রেরি। স্যামুয়েল সেখান থেকে বই নিয়ে পড়ে। স্যামুয়েল জেনেছে জীবাণু ঘটিত রোগের বিরুদ্ধে মানুষের শরীরের এক স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার করলে রোগ সারে। বিজ্ঞানীরা ঠিক করেছেন, সেরাম ও ভ্যাকসিন দিয়ে জীবাণু ঘটিত রোগের চিকিৎসা করবেন।

ডাক্তার ওয়াল একবার এ চেষ্টা করেছিলেন।

ডিপথিরিয়া রোগীর রক্ত নিয়ে ঘোড়ার দেহে ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল। ঠিক করেছিলেন, পরে ওই ঘোড়ার রক্তের জলীয় অংশ নিয়ে ওই রোগীর দেহে ইনজেক্ট করবেন।

কিন্তু ডাক্তারের এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। ঘোড়টি মরে গিয়েছিল।

তবে স্যামুয়েল রফের গভীর বিশ্বাস, এ প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলে একদিন না একদিন সফলতা আসবেই।

ডাক্তার বলে-স্যামুয়েল, তুমি ছেলেমানুষ। অভিজ্ঞতা কম। তাই এসব উদ্ভব চিন্তা করছ। ওসব মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও।

কিন্তু স্যামুয়েল হারবার পাত্র নয়। জীবাণু ঘটিত রোগের রোগীর রক্ত ইনজেকশন করার জন্য চাই বড়ো কোনো জানোয়ার গোরু বা ঘোড়া জাতীয়। ইঁদুর-বেড়াল দিয়ে কাজ হবে না। যত কম ডোজই দেওয়া হোক না কেন, ওরা মরে যায়।

বাড়ি ফিরে এসে স্যামুয়েল দেখল, তার বাবা ঠেলাগাড়িতে রোগা হাড় জিরজিরে একটা ঘোড়াকে জুড়ে দিয়ে সামনে সাইনবোর্ড লাগিয়েছে–রফ অ্যান্ড সন্স।

স্যামুয়েল স্থির করল, ওই ঘোড়া অর্থাৎ ফার্ডকে সে তার পরীক্ষার কাজে লাগাবে। বাবা টেরও পাবে না।

স্যামুয়েলের ল্যাবোরেটরি আস্তাবলের এক কোণে। ডিপথিরিয়া জীবাণুর ব্রথ কালচার। ব্রথটা ঘোলাটে হল। সে কিছুটা ঘোলাটে ব্রথ নিয়ে অন্য জায়গায় রাখল। জল মিশিয়ে গরম করল, এতে জীবাণুরা আধমরা হবে। সিরিঞ্জে ব্রথ ভরে স্যামুয়েল ফার্ডের ঘাড়ে ইনজেকশন দিল, ডাক্তার ওয়াল যেভাবে দিয়েছিল।

এবার প্রতীক্ষার পালা। বাহাত্তর ঘণ্টা পর একটা বড়ো ডোজের ইনজেকশন দিতে হবে। অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি তত্ত্ব নির্ভুল হলে প্রত্যেকটি ইনজেকশনের সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যাবে। তাহলে ঘোড়ার রক্তের জলীয় অংশ হবে–ডিপথিরিয়া সারানোর ওষুধ। যদি

যদি ঘোড়া বেঁচে থাকে, তবেই।

স্যামুয়েল ঘোড়র কাছাকাছি থাকতে শুরু করল। যখনই দেখ জেগে বসে আছে।

বাবা বলল–ঘোড়াটা তোর খুব পছন্দ, তাই না?

এইভাবে কেটে গেল দুটি দিন। তৃতীয় দিন সকালে বাবার চিৎকারে স্যামুয়েলের ঘুম ভাঙল।

ফার্ড আর বেঁচে নেই। কিন্তু আমি তো ওকে চাবুক মারিনি, এমনকি ঠেলাঠেলি পর্যন্ত করিনি। অথচ মরে গেল। ওই ব্যাপারীকে হাতের কাছে পেলে দেখে নিতাম আমরা। ঘোড়া দিয়ে ঠকিয়ে গেল।

ঘোড়া মরে গেল। স্যামুয়েল রফের চোখের রঙিন স্বপ্নেরা বিবর্ণ হয়ে গেল।

.

স্যামুয়েল খবর পেল, বুড়ো ইহুদি ধর্মযাজকের সঙ্গে ডাক্তার তার মেয়ে টেরেনিয়ার বিয়ে ঠিক করেছে। তার মাথায় বাজ পড়ল যেন। সে ছুটে গেল।

বুড়ো র‍্যাবির সঙ্গে টেরেনিয়ার বিয়ে হতে পারে না। আমি ওকে বিয়ে করব।

বেরোও এখান থেকে।

ডাক্তারের বউ বুঝি হার্টফেল করে আর কী।

সেদিন রাতে ঈশ্বরকে প্রথম ভাবল তরুণ স্যামুয়েল-ঈশ্বর, তুমি কি জেগে আছো? দেখতে পাচ্ছো? তুমিই তো টেরেনিয়াকে আমার সামনে এনে দিয়েছিলে। তাহলে কেন তুমি তাকে আমার বউ করে দিচ্ছো না? তোমার কি কোনো মায়া-মমতা নেই? শুনতে পাচ্ছো আমার কথা?

-স্যামুয়েল, দোহাই তোমার। থামো। আমরা সব শুনতে পাচ্ছি। এখন, ঘুমোতে দাও।

পরের দিন বিকেল বেলা, ডাক্তারের বাড়িতে ডাক পড়ল স্যামুয়েলের। ডাক্তার তার বউ আর মেয়েকে নিয়ে বসে আছে।

–শোনো স্যামুয়েল, ডাক্তার বলতে থাকে, আমার মেয়ে র‍্যাবিনোউইচকে বিয়ে করতে চাইছে না। ও বড্ড জেদি। ও তোমাকে বিয়ে করবে বলছে। তুমি কি ওকে ভালোবাসো?

–ইয়েস, স্যার।

–তুমি নিশ্চয়ই চাও না, একটা ফেরিওয়ালার সঙ্গে টেরেনিয়ার বিয়ে হোক।

–নো, স্যার।

কিন্তু তুমি? তোমার বাবা ফেরিওয়ালা। তার মানে তুমিও তত ফেরিওয়ালা।

আমি ফেরিওয়ালা থাকব না চিরদিন।

–বেশ, তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের দিতে পারি। তবে একটা শর্ত আছে। তোমার কথার প্রমাণ করতে হবে। সময় ছ মাস।

–ছ মাস। ইয়েস স্যার।

সম্ভব হবে না। গরিব ইহুদি বস্তির ছেলে ছমাসে সফল হতে পারে না। যদি না অলৌকিক কিছু ঘটে। আইনত তাকে ডাক্তার বলা যাবে না।

আর র‍্যাবি? ইহুদি ধর্মযাজক। তেরো বছর থেকে ধর্ম সংক্রান্ত পড়াশোনা করতে হয়। স্যামুয়েলের সে বয়স নেই।

বড়োলোক? চব্বিশ ঘণ্টা ফেরিগিরি করলেও নব্বই বছর বয়সে বড়োলোক হতে পারবে না।

তবে টেরেনিয়ার বিশ্বাস, ছমাসের মধ্যেই স্যামুয়েল তার কথার সত্যতা প্রমাণ করে দেবেই। ও বুঝি স্যামুয়েলের থেকেও পাগল!

.

সারাদিন বাবার সাথে ফেরির কাজে ব্যস্ত থাকে স্যামুয়েল। রাতে সে ল্যাবরেটরিতে যায়। শত শত ম্যাচ ডিপথিরিয়া সেরাম তৈরি করছে। বেড়াল, খরগোশ, পাখিকে ইনজেকশন দিচ্ছে। ওরা মরে যাচ্ছে। তার চাই ঘোড়া। কিন্তু ঘোড়া কোথায় পাবে?

কিন্তু?

কিন্তু দিন একটা একটা করে চলে যাচ্ছে।

সকালে খ্রিস্টান শহরের তালা খোলামাত্রই স্যামুয়েল ঠেলাগাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়ে। একটু দেরি হলে খ্রিস্টান প্রহরী গর্জে ওঠে। সবুজ পিস্তল নিয়ে তেড়ে আসে–এই ব্যাটা জু। এগিয়ে যা।

ওর কোমরে চেন বাঁধা, সেখানে লটকানো থাকে গেটের বড়ো চাবিটা। বস্তির পরে নদী, নদীর ওপর ব্রিজ। ব্রিজ ধরে পুলিশ স্টেশন বা থানাতে যাওয়া যায়। সন্ধ্যার আগে

কোনো ইহুদি শহর থেকে বেরোতে না পারলে, তাকে শাস্তি পেতে হয়। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় পুলিশ স্টেশনে, সেখান থেকে লেবার ক্যাম্প।

–দুজন করে গার্ড রাতে পাহারায় থাকে। তবে দুজনকে কখনো একসঙ্গে দেখা যায় না। একজন ডিউটি দিলে, অন্যজন ফুর্তি করতে চলে যায়। গেট খোলর পূর্ব মুহূর্তে। আবার এসে সহকর্মীর সঙ্গে কাজে যোগ দেয়।

পল আর আরাম গেটরক্ষক। পল ভালো ছেলে। হাসিখুশি, কিন্তু আরাম? একটা জন্তু, ইহুদিরা ওর চোখে বিষ। মোটাসোটা গাট্টাগোট্টা চেহারা। এখন ওই আরামই স্যামুয়েল রফের দিকে লাল চোখে তাকিয়ে আছে।

এদিকে দিন কাটতে কাটতে ছ-মাসের জায়গায় একুশ দিনে এসে ঠেকেছে। মাত্র তিন সপ্তাহ হাতে। টেরিনিয়া এল একরাতে, চুপিচুপি।

দুহাতে জড়িয়ে ধরল স্যামুয়েলকে–চলো, আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই।

–তা কী করে সম্ভব? অন্য জায়গায় গেলে কি আমার ফেরিগিরি ঘুচবে? আমি সেই ফেরিওয়ালাই থেকে যাব।

–তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই।

টেরেনিয়ার নেই বদনামের ভয়, সে চায় না অর্থের বৈভব, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। কিন্তু স্যামুয়েল?

–টেরেনিয়া, আমি তা চাই না।

.

পরের দিন সকালবেলা।

আইজ্যাক, স্যামুয়েলের স্কুলের বন্ধু, একটা ঘোড়াকে নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। ঘোড়াটা যেমন রোগা, তেমনি কালো আর বেতো। ওর নাম লটি।

স্যামুয়েলকে দেখে আইজ্যাক বলল–আটা তৈরির কারখানায় লটিকে নিয়ে যাচ্ছি। ওর বিনিময়ে যদি দু ফ্লোরিন পাই, তাহলে একটা ঠেলা গাড়ি কিনব।

স্যামুয়েলের হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল–আমি তোমায় ঠেলাগাড়ি দেব, আমাকে তোমার ঘোড়াটা দাও।

ফার্ডের বদলে এল লটি। স্যামুয়েল নতুন গাড়ি বানিয়ে নিল। এবার লটির ওপর শুরু হল তার পরীক্ষা।

-লটি, চিকিৎসাবিজ্ঞানে তুমি এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে।

.

অপরিচ্ছন্ন আর ঘিঞ্জি ইহুদি বস্তি। ভয়ংকর সব বাজে বাজে সংক্রামক রোগ লেগেই আছে বস্তিতে। কারও বিশ্রী কাশি হচ্ছে, গ্ল্যান্ড ফুলে উঠছে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মরে যাচ্ছে। কী কারণ? ডাক্তারদের কাছে উত্তর নেই।

আইজ্যাকের বাবারও ওই অসুখ করেছে। স্যামুয়েল ছুটে গেল তাদের বাড়িতে। ওর বাবা খুব কাশছে।

কাঁদতে কাঁদতে আইজ্যাক বলল–ডাক্তার বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছে।

শোনো আইজ্যাক, তোমার বাবা মুখে রুমাল চাপা দিয়ে কাশবে। ওই রুমালটা তুমি আমাকে দেবে। তবে সাবধান, ওতে অনেক জীবাণু থাকে।

এক ঘন্টা পরে রোগীর রুমাল থেকে স্যামুয়েল শুকনো থুথু গয়ের চেঁছে তুলল। ব্রথভর্তি একটা প্লেটে তা রাখল। শুরু হল অজানা জীবাণুর ব্রথ কালচার। সেই ব্রথ সে লটির শরীরে ইনজেকশন দিল। তবে ডোজ কম ছিল। পরপর দুদিন। তারপর ডোজ বাড়িয়ে দিল।

স্যামুয়েলের সাধনা বুঝি সার্থক হল। লটি বেতো, কানা, শুটকো হলে কী হবে, ইনজেকশনে সে মরল না। স্যামুয়েল ওর রক্তের জলীয় অংশ থেকে তৈরি করল অ্যান্টি টক্সিন।

এল সে আইজ্যাকের বাড়িতে। ওর বাবা বিছানায় শুয়ে আছে, দারুণ কাশছে। কাশির দমকে তার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। বাড়িতে লোক গিজগিজ করছে। সবাই বলছে বুড়ো এবার মারা যাবে। ডাক্তারও শেষ কথা বলে গেছে।

স্যামুয়েল বন্ধু ও তার মাকে বলল, যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ চেষ্টা করতে দোষ কী। সিরিঞ্জ দেখিয়ে বলল, এটাতে কাজ হতে পারে।

আইজ্যাকের বাবাকে ইনজেকশন দেওয়া হল। কাশির দমক বাড়ছে বৈ কমছে না। আইজ্যাকের চোখ ছলছল। স্যামুয়েল সেখানে ঘণ্টা তিনেক থেকে বাড়ি ফিরে এল।

পরের দিন সকালে ঠেলাগাড়ি নিয়ে স্যামুয়েল বাজারের উদ্দেশ্যে রওনা হল। সেদিন বাজারে যেন মানুষের ঢল নেমেছে। তাই কেনাকাটা করতে দেরি হয়ে গেল স্যামুয়েলের। সন্ধ্যে হতে বেশি দেরি নেই। এবার বাড়ি ফিরতে হবে। ইহুদি বস্তির কাঠের গেট থেকে দু মাইল দূরে সে তখন, গাড়ির চাকা গেল খুলে। খ্রিস্টান পুলিশম্যান এগিয়ে এল। তাকে সাহায্য করল, কামারশালা থেকে চাকা জোগাড় করে নিয়ে এল স্যামুয়েল। চাকা গাড়িতে লাগাতে হবে। স্যামুয়েলকে অবাক করে দিয়ে পুলিশম্যান তাকে এই কাজে সাহায্য করল। কেটে গেল প্রায় তিরিশ মিনিট। স্যামুয়েলের মাথায় তখন একটা চিন্তা-আইজ্যাকের বাবা কি মরে গেল? নাকি বেঁচে আছে?

সূর্য ঢলে পড়ল পশ্চিম দিগন্তে। আর মাত্র এক মাইল দূরে ইহুদি বস্তি, বস্তির গেট বন্ধ হয়ে গেল।

স্যামুয়েল তালাবন্ধ গেটের সামনে এসে পৌঁছোল। গার্ড আরাম তখন পাহারা দিচ্ছে।

স্যামুয়েল বলল–স্যার, গাড়ির চাকা খুলে যাওয়ায়–

–বোকা ইহুদি কুত্তার বাচ্চা। প্রহরী খপাৎ করে তার কলার চেপে ধরল।

-সন্ধ্যার পর গেটের বাইরে যাবার হুকুম নেই জানিস না। চল্ থানায়। তোকে জাহাজে তুলে দেওয়া হবে। চলে যাবি সাইলেসিয়ায়। দশ বছর জেলের ঘানি টানবি। সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করবি। সাইলেসিয়ায় এখন ভীষণ ঠান্ডা। তুই কয়লার খনির গরমে একা কাজ করবি। কয়লার গুঁড়া ফুসফুঁসে ঢুকবে। তুই কাশবি। ওরা তোকে ধরে এনে বরফের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ব্যাস, তুই অক্কা যাবি।

–স্যার, দোহাই আপনার, আমার বাড়িতে একটা খবর

ইহুদি জানোয়ার। কথা বাড়াবি তো তোর বীচিটা ফাটিয়ে দেব। চল থানায়। সরু ব্রিজের ওপর দিয়ে তখন স্যামুয়েলকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে আরাম। নীচে ফুলে ফেঁপে ওঠা নদীর স্রোত। হঠাৎ পকেট থেকে ব্যাগ বের করে দড়ি খুলে দিল স্যামুয়েল। ঝনঝন শব্দে খুচরো টাকা নীচে পড়ল। আরাম ছুটে এল। টাকা তুলতে ব্যস্ত। স্যামুয়েল এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। একটা বড়ো পাথর তুলে সজোরে মেরে দিল আরামের চোয়াল লক্ষ্য করে। আবার–আবার আঘাত। আরামের মুখ চোখ ফেটে রক্ত ঝরছে। একসময় সে পড়ে গেল এবং মরে গেল।

মৃত প্রহরীর শরীরের দিকে তাকিয়ে রইল স্যামুয়েল। অবাক দৃষ্টি। সে কি সত্যিই ওকে হত্যা করল! বিশ্বাসই হচ্ছে না। পুলিশ ব্যারাক খুব কাছে। প্রহরীদের গলার স্বর অবধি শোনা যাচ্ছে। ওরা যদি টের পায় স্যামুয়েল আরামকে হত্যা করেছে তাহলে তাকে আর সাইলেসিয়ায় পাঠাবে না এখানেই রেখে দেবে। চাবুক মারবে। তারপর টাউন স্কোয়ারে তার ফাঁসি দেবে। পুলিশম্যান, যদি সে হয় খ্রিস্টান পুলিশম্যান, তার গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত

বসাতে পারবে না কোনো ইহুদি। তাহলে তার হবে প্রাণদণ্ড। আর এ তো মানুষ খুন! কী করবে সে এখন? দেশ ছেড়ে পালাবে? না, জীবনে আর তাহলে এমুখো হতে পারবে না। মাথায় একটা বুদ্ধি এল স্যামুয়েলের।

মৃত প্রহরীর কাছ থেকে গেট খোলার চাবিটা নিয়ে নিল সে। তারপর ভারী মৃতদেহটা টানতে টানতে ব্রিজের ওপর থেকে নদীর জলে ফেলে দিল।

স্রোতের টানে সেটা অনেক দূরে চলে গেল। যে পাথরটা দিয়ে আরামকে মেরেছিল, সেটাও সে জলে ফেলে দিল। অচিরেই তলিয়ে গেল সেটা অতল গহ্বরে। তারপর লাগালো ছুট, ব্রিজ পার হয়ে গেটের সামনে এল। গেট খুলে ঠেলা নিয়ে ভিতরে ঢুকল। দরজাটা আলগা করে বন্ধ করে দিল। তারপর বাড়ি ফিরে এল।

বাড়িতে সবাই তখন চিন্তিত মুখে বসে আছে। স্যামুয়েলকে দেখে তারা হতভম্ব হয়ে। গেল, যেন ভূত দেখছে।

ওর বাবা বলল–তোমায় ওরা আসতে দিল? আমি তো ভেবেছিলাম

স্যামুয়েল সংক্ষেপে সব কথা গড়গড়িয়ে বলে গেল।

বাবা আঁতকে উঠল–হ্যায় যিশু, এবার আমাদের প্রাণ যাবে!

আমার কথা শোনো, দেখবে কিছু হবে না।

মিনিট পনেরো পরে স্যামুয়েল তার বাবা আর দুজন ইহুদি প্রতিবেশীকে সঙ্গে নিয়ে গেটের কাছে এল। অন্য গার্ড তখনও ফিরে আসেনি বলে রক্ষে। স্যামুয়েল বাইরে গিয়ে। তালা লাগিয়ে দিল। তারপর দড়ি বেয়ে গেট টপকে ভিতরে চলে এল।

–ভোর হলে কী হবে? স্যামুয়েলের বাবা আতঙ্কিত।

–আমরা গেটে ধাক্কা দেব। চিৎকার করে বলব, গেট খোলো, গেট খোলো

ভোর হতে না হতেই ইহুদি ব্যবসায়ীরা গেটের সামনে এসে জড়ো হয়েছে। গেট খোলার জন্য শোরগোল করছে। দেখা গেল সেখানে পালে পালে ইউনিফর্ম পরা সৈনিক ও পুলিশ এসে জড়ো হয়েছে। কিন্তু চাবি কোথায়? বিশেষ একটা চাবি খুঁজে পাওয়া গেল। দরজা খোলা হল। রাতের প্রহরী পলকে জেরা করা হল। সে স্বীকার করল, রাতে সে ডিউটিতে ফাঁকি দিয়ে ফুর্তি করতে গিয়েছিল। তাকে জেলে পাঠানো হল। কিন্তু আরাম? দেখো গিয়ে কোন্ গার্লফ্রেন্ডের পাল্লায় পড়েছে। আর চাবি? নিশ্চয়ই কোথাও ফেলে দিয়েছে। আসল চাবিটা স্যামুয়েল পুঁতে রেখেছে–এ খবর কেউ জানল না।

সারাদিন-রাত অনেক ধকল গেছে। ক্লান্ত অবসন্ন শরীর। গভীর ঘুমে ডুবে গেল স্যামুয়েল।

আইজ্যাক তার ঘুম ভাঙানোর জন্য ঠেলাঠেলি করছে। আচমকা ঘুম ভেঙে গেল স্যামুয়েলের। ভাবল, নিশ্চয়ই আরামের ডেডবডি পাওয়া গেছে। তাই পুলিশ এসেছে তাকে ধরে নিয়ে যেতে।

চোখ মেলে দেখে আইজ্যাক হিস্টিরিয়া রোগীর মতো চেঁচাচ্ছে–স্যামুয়েল, ওঠো। শিগগির এসো। আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেছে! বাবার কাশি সেরে গেছে।

আইজ্যকের বাবা বিছানায় উঠে বসেছে। তার জ্বর, কাশি কিছুই নেই। মুরগির সুপ খাবার ইচ্ছা জেগেছে তার।

স্যামুয়েল ভাবল, আজ সে একটা জীবন নিয়েছে বটে, কিন্তু একটা জীবন দানও করেছে। তার দুচোখ জলে ভরে গেল।

ইহুদি বস্তির মধ্যে খবরটা অতি দ্রুত রটে গেল–আইজ্যাকের বাবাকে আশ্চর্য এক ওষুধে স্যামুয়েল রফ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

ফলে মৃতপ্রায় প্রিয়জনকে বাঁচাতে ছুটে এল আত্মীয়রা। সবাই বলছে, আমাদের রোগীকে বাঁচান। ওই ম্যাজিক সেরাম দিন। কিন্তু অত সেরাম কোথায়? তৈরি করার লোকও তো দরকার।

স্যামুয়েল ছুটে গেল ডক্টর ওয়ালের কাছে। সব ঘটনা তাকে বলল। ডাক্তার সন্দিগ্ধ। নিস্পৃহ কণ্ঠস্বর–আগে নিজের রোগীদের ওপর প্রয়োগ করে দেখি।

বারোজন রোগীর মধ্যে একজনকে বেছে নেওয়া হল। তার শারীরিক অবস্থা সবচেয়ে আশঙ্কাজনক। তাকে সেরাম দেওয়া হল। রোগীর শারীরিক উন্নতি চোখে পড়ল।

স্যামুয়েল রফ তার ল্যাবরেটরিতে বসে আছে, আস্তাবলের পাশে।

ডাক্তার এল সেখানে স্যামুয়েল, তুমি তোমার শর্ত পূরণ করেছ। তোমার সেরামে কাজ হয়েছে। তোমাকে আমি একটা উপহার দিতে চাই। যৌতুকে কী নেবে বলো?

স্যামুয়েলের তরুণ চোখে ক্লান্তির ছাপ উপহার? একটা ঘোড়া।

.

০৯.

শুরু হল রফ অ্যান্ড সন্স-এর পথ চলা। আজ যা আন্তর্জাতিক মাল্টিন্যাশনাল ওষুধ নির্মাণ প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে।

১৮৬৮-স্যামুয়েল টেরেনিয়াকে বিয়ে করল।

শশুর ডাক্তার জামাইকে যৌতুক দিল ছটা ঘোড়া একটা ল্যাবোরেটরি আর কাজ করার জন্য ভালো কিছু যন্ত্রপাতি।

গাছগাছড়া থেকে স্যামুয়েল ওষুধ বানালো। প্রতিবেশীরা সেই ওষুধ ব্যবহার করে সুফল পেল। ধীরে ধীরে স্যামুয়েলের নাম ছড়িয়ে পড়ল।

গরিব মানুষদের স্যামুয়েল এমনিতেই ওষুধ দিয়ে দিত। পয়সা নিত না।

বউকে সে বলল–ওষুধ আসলে অসুখ সারানোর জন্য, লাভের জন্য নয়।

দিনে দিনে স্যামুয়েলের ব্যবসা বাড়তে থাকল। একটা দোকান খোলা হল। সেখানে মলম, পাউডার এবং প্রেসক্রিপশন ছাড়া অন্যান্য ওষুধও রাখা হল।

এখন স্যামুয়েলের কদর বেড়ে গেছে, ওই সব বড়োলোক ইহুদিদের কাছে। তারা স্যামুয়েলের ব্যবসার অংশীদার হতে চাইল। কিন্তু সে রাজি নয়।

কারণ?

শ্বশুর ডাক্তার ওয়ালের জবাবে সে বলল–শেয়ালকে মুরগির ঘরে ঢুকতে দিলেই একদিন না একদিন তার খিদে পাবে।

স্যামুয়েলের ব্যবসা ও সংসার–দুটোরই শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে। আব্রাহাম, জোসেফ, আন্তন, জান ও পিতোর–তাদের পাঁচ ছেলে।

স্যামুয়েল ছেলেদের নামে নামে একটা করে ওষুধের দোকান খুলল।

ইতিমধ্যে ইহুদিদের ওপর থেকে অনেক বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হয়েছে। ক্রাকো শহরের খ্রিস্টান এলাকায় ওষুধের দোকান খোলার অনুমতি পেল সে।

আজ স্যামুয়েল সত্যিই স্বাধীন। তার নাম-প্রতিপত্তি-খ্যাতি বেড়েছে। বস্তির নোংরা এলাকা সে ত্যাগ করল। শহরে সে নতুন তিনতলা বাড়ি তৈরি করল।

স্যামুয়েলের স্বপ্নের শেষ নেই।

ছেলেরা বড় হয়ে উঠছে। তাদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা করে গৃহ শিক্ষকের ব্যবস্থা করেছে বাবা স্যামুয়েল। ওদের জন্য তার পরিকল্পনার অন্ত নেই। লোকে অত কিছু ভাবে না। তার কাজকর্ম দেখে হাসাহাসি করে।

ওর শাশুড়িও বলে জামাইয়ের কাণ্ডকারখানা দেখো, পাগল।

আব্রাহাম ও জান শিখছে ইংরাজি। জোসেফ জামান, আন্তন ফরাসি আর পিতোর । ইতালিয়ান ভাষা শেখার প্রয়াস চালাচ্ছে।

এসব ভাষা শিখে কী যে লাভ! এখানে কেউ কোনোদিন ওই ভাষা জানে না। ছেলেরা পরস্পরের মধ্যে কথা বলতে পারবে না।

স্যামুয়েল হাসে–এটা ওদের শিক্ষার অঙ্গ।

সে জানে, তাদের ছেলেরা বড়ো হলে এই ভাষাজ্ঞান কোন্ কাজে লাগবে।

স্যামুয়েল ছেলেদের বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করল। ওরা সেখানকার শিক্ষাদীক্ষায় তৈরি হবে। এই সুযোগে ব্যবসার কিছু ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের ব্যবস্থাও করে ফেলল সে।

আব্রাহাম এখন একুশ বছরের যুবক। তাকে আমেরিকায় পাঠানো হবে।

আব্রাহামের দিদিমা এ কথা শুনে আঁতকে ওঠে–সেকি? ওখানে তো জংলিদের বাস! নিরাপত্তার অভাব। ও কখনো আমেরিকায় যাবে না।

স্যামুয়েল মনে মনে বলল–নিরাপত্তা? ইহুদিদের নিরাপত্তা? পৃথিবীর কোথাও নেই। ইহুদি নিধন যজ্ঞ সর্বত্র চলে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে মায়ের আগুনে ঝলসে যাওয়ার মৃত্যু দৃশ্য।

ছেলেরা কে কোথায় যাবে, নতুন শাখা খুলবে রফ অ্যান্ড সন্সের সেগুলো স্যামুয়েল ঠিক করে ফেলেছে। আব্রাহাম ইয়র্কে নতুন শাখা খুলবে। একুশ বছর বয়সের জোসেফ যাবে বার্লিনে, সেখানে রফ অ্যান্ড সন্সের ফ্যাক্টরির দায়িত্ব নেবে। আন্তন যাবে ফ্রান্সে, জান ইংল্যান্ডে আর পিতোর যাবে ইতালিতে।

পাঁচ বছরের মধ্যে পৃথিবীর পাঁচটি নামকরা দেশে রফ অ্যান্ড সন্স-এর নতুন শাখা প্রতিষ্ঠিত হল।

উকিল ডাকা হল। আন্তর্জাতিক বহুজাতিক এই সংস্থার আইনকানুন বেঁধে দেওয়া হল।

–পরিবারের বাইরের কেউ এই কোম্পানির পরিচালনার দায়িত্ব পাবে না। কোম্পানির শেয়ার কেউ বিক্রি করতে পারবে না। শেয়ার বেচতে হলে প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারদের একমত হতে হবে। প্রত্যেক অংশীদার সুন্দর ভালো বাড়িতে বাস করবে। মোটা অঙ্কের মাইনে পাবে। বড়ো ছেলে ও তার উত্তরাধিকারীদের হাতে থাকবে কোম্পানির বেশিরভাগ শেয়ার। আমেরিকার ধনকুবের রথসচাইল্ডের চেয়েও বড়ো হওয়ার স্বপ্ন সফল করতে চায় । রফ অ্যান্ড সন্স।

.

স্যামুয়েল ও টেরেনিয়ার এখন সুখের সংসার। দিন কাটছে। ব্যবসার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে। জন্মদিনে ও ছুটিতে ছেলেরা বাড়িতে আসে। আনন্দ করে। তার ফাঁকে ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনা হয়।

কোনো ভাই ওষুধ সংক্রান্ত কোনো গবেষণার খবর পেলেই অন্য দেশে অন্য ভাইয়ের কাছে সঙ্গে সঙ্গে তা জানিয়ে দেয়। প্রতিদ্বন্দ্বীদের পেছনে ফেলে তখন রফ অ্যান্ড সন্স ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলেছে।

শতাব্দীর চাকা ঘুরল।

স্যামুয়েল রফের ছেলেরা ঘরে বউ আনল। সংসার বাড়ল।

আব্রাহাম বিয়ে করল আমেরিকান তরুণীকে। তার ছেলে.উড্রো, নাতি স্যাম। এই হল এলিজাবেথের বাবা, স্যাম রফ। জোসেফের বউ এক জার্মান তনয়া। নাতনির নাম অ্যানা, ওয়ালথার গ্যাসনার যার স্বামী। আন্তন রফ বিয়ে করল এক ফরাসি মেয়েকে। তার ছেলের একমাত্র মেয়ের নাম হেলেন। সে বহুবার বিয়ে করেছে। কোনো ছেলে-মেয়ে নেই। জান রফের স্ত্রী ইংল্যান্ডবাসী এক মেয়ে। তার নাতির নাম স্যার অ্যালেক রফ। পিলের বিয়ে করেছে এক ইতালিয়ান তনয়াকে। তার নাতনি সিমনেত্তা, বিয়ে করেছে ইভো পালাজজিকে।

অর্থাৎ স্যামুয়েল ও টেরেনিয়া রফের বংশধর হল এলিজাবেথ, অ্যানা, হেলেন, স্যার অ্যালেক ও সিমনেত্তা পালাজজি।

স্যামুয়েল তখন বেঁচে আছে। মারকনি বেতার যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। রাইট ভ্রাতৃদ্বয় প্রথম উড়োজাহাজ আকাশে ওড়াল কিটি হকে। স্যামুয়েল দেখেছে। দ্রে্য মামলা আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করল। ফরাসি কথাসাহিত্যিক এমিল জোলা সহায়তা করেছিলেন। অ্যাডমিরাল পিয়ারি প্রথম উত্তর মেরুতে পৌঁছেছিল। তখন পৃথিবীর বুকে কতরকম পরিবর্তন ঘটে চলেছে। স্যামুয়েল দেখল লাখে লাখে ফোর্ডের মডেল টি গাড়ি পথে চলছে। মানুষ বিজলিবাতি ও টেলিফোন ব্যবহার করতে শিখল। চিকিৎসাবিজ্ঞানও পিছিয়ে নেই। কী কারণে টিউবারকুলোসিস, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি রোগ হয় তাও জানা গেল।

গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে রফ অ্যান্ড সন্স আন্তর্জাতিক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের রূপ ধারণ করল।

এসবের মূলে কে? কেন? স্যামুয়েল রফ আর তার বেতো রোগা ঘোড়া লটি। যে স্যামুয়েল গরিব ইহুদি বংশজাত, যাদের ওপর খ্রিস্টানরা পৈশাচিক অত্যাচার করে, যে স্যামুয়েল পরাধীনতার গ্লানি ঘুচিয়ে স্বাধীনতার মুখ দেখতে চেয়েছিল। ইহুদি শুধু মরে আর মার খায়। কারণ তারা গরিব। গরিব মরে ও মার খায়। কোনো কোনো গরিব ইহুদি অবশ্য : সাহস দেখায়, লড়াই করে এবং জয়ী হয়।

.

এলিজাবেথ বেশ কয়েকবার বইটা পড়ল। বইটা তার অস্তিত্বের অংশ। শুধু তার কেন, তাদের সকলের। সে বইটা জায়গা মতো রেখে দিল।

এই সে প্রথম জানল, তার বংশ পরিচয়।

স্কুলে ব্যাল নাচের ক্লাসটা এলিজাবেথের মোটেও ভালো লাগে না। সে তখন চোদ্দো বছরের। ড্যান্স টিচার মাদাম নেতুরো ক্লাসে বলল–আর কিছুদিন পরে ব্যাল নাচের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ছেলে মেয়েদের গার্জেনদের নেমতন্ন করা হবে সেই অনুষ্ঠানে।

যেদিন নাচের অনুষ্ঠান সেদিন স্যাম রফ বাড়ি ফিরল দশদিন পর।

মেয়ে বলল–আজ আমার নাচের স্কুলে ব্যালের অনুষ্ঠান। তুমি নিশ্চয়ই যেতে পারবে না?

–নিশ্চয়ই যাব।

এলিজাবেথ অবাক।

.

অডিটোরিয়াম ভরে গেছে। ছেলেমেয়েদের বন্ধুরা, মা-বাবারা এসেছে। স্টেজের দু-পাশে রাখা গ্র্যান্ড পিয়ানো। কোপপেলিয়া, সিনডরেলা এবং সোয়ান লেকের অনুষ্ঠান।

প্রত্যেক মেয়ে একবার করে একা নাচবে। এলিজাবেথও নেচেছিল। ওর সময় ছিল মাত্র এক মিনিট। অন্যান্যরা কী সুন্দর নৃত্য পরিবেশন করছে, যেন মারকোভা বা ম্যাকসিমোভা!

এলিজাবেথ স্টেজে এল। নাচতে লাগল। নাচ শেষে ভদ্রতার খাতিরে সকলে হাততালি দিল। বাবা মুচকি হাসল। এলিজাবেথ খুশি। বাজনা থেমে গেছে। এলিজাবেথ আবার নাচতে শুরু করল। অগত্যা পিয়ানোবাদক বাধ্য হয়ে আবার বাজাতে শুরু করল। স্টেজের আড়ালে দাঁড়িয়ে তখন মাদাম রাগে দাঁত কিড়মিড় করছে।

নাচের প্রোগ্রাম শেষ হল। স্যাম রফকে নাচের দিদিমণি বলল–যে মেয়ে কথা শোনে না, তাকে সহ্য করা যায় না। ও নেচেই যাচ্ছিল। যেন কোনো নাম করা নাচিয়ে হয়ে গেছে।

-ঠিকই বলেছেন। আমি ওকে শাস্তি দেব।

–ধন্যবাদ, মিস্টার রফ দেখুন কী করতে পারেন।

মাদাম চলে গেল।

স্যাম রফ বলল–লিজা, চকোলেট সোডা তোমার কেমন লাগে।

এলিজাবেথের চোখে জল।

বাবার কাছে সে গল্প শুনেছে। তখন বাবা টোকিওতে। জাপানিরা চকোলেটের সঙ্গে গঙ্গা ফড়িং খেতে দিয়েছিল। বাবা খেয়েছিল।

–তুমি আমার ওপর রাগ করোনি?

বাবার চোখে-মুখে খুশির হাসি–কেন? তুমি তো সবাইকে টেক্কা দিতে চেয়েছিলে। তুমি তোমার বংশধারা অনুযায়ী কাজ করেছ। এটাই রফ পরিবারের বৈশিষ্ট্য।

পরের দিন বিকেলে বাবার সেক্রেটারি এসে জানাল-তোমাকে সুইজারল্যান্ডে যেতে হবে। সেখানে বোর্ডিং স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

.

সুইজারল্যান্ড। গ্রাম্য পরিবেশে বোর্ডিং স্কুলটা। বিখ্যাত স্কুল। মেয়েদের ও ছেলেদের আলাদা স্কুল। মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। তারা ছেলেদের শরীরের সমস্ত কিছু। জানে। কোন্ ছেলের পুরুষাঙ্গ কত বড়ো, তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প করে। ওরা সর্বদা যৌন প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসে। ওরা জানে, একটা মেয়ে উলঙ্গ হয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকলে, তার নিতম্ব থেকে বুক অব্দি আঙুলের চাপ দিয়ে কীভাবে যৌন উন্মাদনা জাগিয়ে তুলতে হয়। যে মেয়েটি এই পুলক জাগানোর কাজটি করে তাকে ওরা একটা প্যাস্ট্রি দেয়। বাথরুমেও ওরা একটা খেলা খেলে। মস্ত বড়ো বাথটবে শুয়ে মেয়েরা হ্যান্ড, শাওয়ারের মুখটা দু পায়ের ফাঁকে রেখে গরম জলের ধারা দেয়। যৌন পুলক জাগে দেহে ও মনে। এলিজাবেথ এসব পছন্দ করে না।

.

পনেরো বছরের জন্মদিন। এলিজাবেথ রফের। যথারীতি বাবা আসতে পারেনি। এসেছিল রিস্ উইলিয়ামস। ওদের মধ্যে এই প্রথম পরিচয়। বাবার হয়ে সে একটা উপহার দিয়েছিল লিজাকে।

বাবা আসেনি, মেয়ের মুখ ভার।

রিস্ ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল–চলো, ডিনার খাওয়া যাক।

রিস্ সুন্দর, সুদর্শন চেহারা। এলিজাবেথ তার ডাকে সাড়া দিল না। তাকে ওর সাথে মানাবে না ভেবে।

কিন্তু রিস ছাড়ল না।

তার গাড়িতে উঠে লিজা বলল–তুমি উল্টো দিকে গাড়ি ড্রাইভ করছ।

–আমরা এখন প্যারীতে যাচ্ছি। কারণ পনেরোর তরুণীদের প্যারীর ম্যাক্সিমে ডিনার। খেতে হয়।

প্রাইভেট জেটে প্যারী গিয়েছিল তারা ডিনার খেতে।

তারা খেয়েছিল লবস্টার, ডাক আলা অরেঞ্জ, ম্যাকসিমের স্পেশ্যাল স্যালাড, শ্যাম্পেন আর বার্থডে কেক।

এলিজাবেথ রফের জীবনের সুন্দরতম সন্ধ্যা।

রিস্ তাকে আবার স্কুলে ফিরিয়ে দিয়ে গেল। সে বলেছিল–তোমাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব।

ওটা তোমার বাবার পাওনা। রিস হেসেছিল।

কিন্তু এলিজাবেথ জানে, রিস মিথ্যে বলছে। কী আকর্ষণীয়, কী সুন্দর দেহ!

রাতে ঘুম এল না এলিজাবেথের চোখের তারায়। সে টেবিলে বসল। লিখল-মিসেস রিস উইলিয়ামস। তারপর আপন মনে লেখাটার দিকে তাকিয়ে রইল।

.

লিজার জন্মদিনের দিন এক চিত্রতারকার সঙ্গে রিস্ উইলিয়ামসের সাক্ষাৎ করার কথা ছিল। কিন্তু লিজের জন্য সেটা বাতিল করে পরের দিন করা হয়েছিল। ম্যাকসিমের রেস্তোরাঁয় সেই চিত্রতারকার সঙ্গে কথা বলতে বলতে রিসের মনে হয়েছিল, ওর চেয়ে লিজাই ভালো।

লিজার মনে এখন একটা অহংবোধ জেগেছে। নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সে সচেতন। হয়তো স্যামুয়েল রফের সংঘাতময় জীবনের ইতিবৃত্ত জেনে তার মধ্যে এই পরিবর্তন দেখা দিল। রিস্ উইলিয়ামস নামে এক সুদর্শন সপ্রতিভ যুবকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে বলেও হতে পারে।

এলিজাবেথ নিজেকে আর গুটিয়ে রাখল না। সে খেলাধুলায় অংশ নিল। দেখা গেল, শরীরের প্রতিও সে যত্নশীল হয়ে উঠেছে। মেয়েদের পাজামা পার্টিতে যোগ দিচ্ছে। সেখানে পাজামাপরা মেয়েরা মারিজুয়ানা বা চরসের সিগারেট খেয়ে নেশা করে।

রেনী টোকা, এক ফরাসি মেয়ে, এগিয়ে এল লিজ, তুমি স্মোক করো?

করি। ডাহা মিথ্যে বলল এলিজাবেথ।

লিজ শুনেছে, গাঁজা, হাসিস, মারিজুয়ানার নেশা করলে মানুষের সংযমের বাঁধ ভেঙে যায়। সে তার অস্তিত্বের কথা ভুলে যায়।

রেনী তার হাতে বাদামি রঙের সিগারেট তুলে দিল। টান দিল এলিজাবেথ–কোথায় যেন, দূরে ভেসে যাচ্ছে সে। দূর থেকে ভেসে আসছে মেয়েদের গলার আওয়াজ। সে উড়ে যাচ্ছে আল্পসের মাথার ওপর দিয়ে, সাদা মেঘের ভেলায় চড়ে।

ফরাসি মেয়েটি তাকে ধাক্কা দিল–কেমন লাগছে, রফ?

দারুণ! এলিজাবেথ নেতিয়ে পড়া চোখদুটো কোনোরকমে খুলল, মারিজুয়ানার নেশা এই প্রথম।

–মারিজুয়ানা? এটা একটা সাধারণ সিগারেট!

.

মেয়েদের সুইস স্কুল। ফরাসি ভাষা ও ফ্যাশান শেখানো হয়। নামডাক আছে স্কুলটার।

ফ্যাশান টিচার মাদামোয়াজেল শাতাল হ্যারিয়ৎ। অল্প বয়স। মেয়েদের তিনি বলেন, ড্রেস যতই স্মার্ট হোক না কেন, ব্রা-প্যান্টি ঠিক না হলে বিশ্রী দেখায়।

এলিজাবেথের নানা সমস্যার কথা তিনি শুনেছেন। ওকে অনেক সহানুভূতি দেখান তিনি। কেক ও গরম চকোলেট খেতে দেন। ওর স্তন ছুঁয়ে আদর করেন।

মাদামোয়াজেলের সুডৌল স্তন, লম্বা পা। এলিজাবেথ তার উলঙ্গ চেহারার কথা চিন্তা করে।

আচমকা তার মনে একটা প্রশ্ন জাগে–আমি কি সমকামী?

সমকামী লেসবিয়ান মেয়েদের কথা লিজা বইয়ে পড়েছে। সমাজের চোখে এটা নিন্দনীয়। পুরুষের সঙ্গে প্রেমহীন বিয়ের থেকে মেয়েমানুষের সঙ্গে সমকামিতা কি এতই খারাপ? লিজা জানে, তার বাবা একথা জানলে কষ্ট পাবে। মেয়ে সমাজের বাইরে অচ্ছুতের মতো দিনযাপন করবে, বিয়ে করবে না, সংসার করবে না, ছেলেমেয়ে হবে না এটা তার ভালো লাগার কথা নয়। তবু সে মাদামোয়াজেল হ্যারিয়ৎকে নিয়ে তার পেইন্টিং করা সুন্দর ছোট্ট ঘরে বসবাস করবে।

এলিজাবেথ রফের স্বপ্নে তখন মাদমোয়াজেল বিচরণ করছে। তারা একসঙ্গে ডিনারে বসেছে-স্যালাড, লবস্টার, বরফ আর ফরাসি মদ। চুল্লিতে আগুন জ্বলছে। কার্পেটের ওপর মুখোমুখি বসে আছে তারা। কবিতা পড়ছে–টি এস এলিয়ট, অথবা ভি জে রাজাধন

ভালোবাসার শত্রু।

সময়-সোনালি মুহূর্তগুলো তাড়াতাড়ি কেড়ে নেয়। আমি কখনও বুঝিনি কেন প্রেমিকের সুখের পরিমাপ।

দিন রাত মাস বছর,
ভালোবাসা যখন মাপা যায়।
আমাদের দুঃখ সুখে, হাসি-কান্নায়

কবিতা পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ল এলিজাবেথ রফ। ঘুম ভাঙল যখন, চাঁদের আলোয় দেখল, মাদমোয়াজেলের নগ্ন শরীর। ছোটো আপেলের মতো দুটি বুক, একটু ঝুলে গেছে। ভুড়ি আছে সামান্য। পাছাল্যাপাপোছা।

মাদমোয়াজেল এলিজাবেথের কাছে এল, ওকে চুমু দিল, স্তন টিপে ধরল। তার হাত এবার উরুর দিকে নামতে শুরু করেছে। লিজের মোটেও ভালো লাগল না।

একেই কি বলে সমকামিতা? লেসবিয়ান রমণীরা এই সুখ ভোগ করে?

আমি ও তুমি শরীরে শরীরে রাখলে।

আকাশ ও নক্ষত্র কেঁপে ওঠে–এই সেই ক্ষণ!

কোথায় গেল সেই মুহূর্ত, মোমবাতি ডিনারের, একসাথে, দুই মেয়েমানুষের জীবন কাটানোর সুখস্বপ্ন?

এলিজাবেথের ভালো লাগছে না, মাদমোয়াজেলের চুমু, আদর, আঙুলের ছোঁয়া, কেমন। বিশ্রী লাগছে তার।

–সোনামণি, এবার তোমাকে আমি করব। মাদমোয়াজেল বলে ওঠে।

–কিন্তু তোমার বা আমার সেই সব প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নেই।

এলিজাবেথ হাসছে, কাঁদছে। সে যেন হিস্টিরিয়া রোগী। সে বুঝল, সে একটা স্বাভাবিক মেয়ে, সমকামী নয়।

কিন্তু যৌন তৃপ্তি মেটাতে হবে। সে বাথরুমে ঢুকে হ্যান্ড শাওয়ারের নল ঢুকিয়ে দিয়ে রতি তৃপ্তি লাভ করল।

.

১০.

সার্ডিনিয়ার ভিলা। এলিজাবেথ রফ এসেছে ইস্টার ছুটিতে। দশদিন থাকবে। এখন তার বয়স আঠারো। এ বছর স্কুল ফাইনাল দেবে। সে গাড়ি চালাতে জানে। এই প্রথম দ্বীপটা একা ঘুরে বেড়াবার অনুমতি পেল। ভূমধ্যসাগর, তপ্ত রোদের আলো, জলের বুকে গা ভাসানো, রাতে বিছানায় শুয়ে পাথরের গান, বিষাদের সুর শোনা, যা এখানে পাথরের ফুটোতে হাওয়া ঢুকে এক অদ্ভুত সুরের সৃষ্টি হয়। টেমপিও-য় ক্যার্নিভ্যালে সারা গায়ের লোক জাতীয় পোশাকে সেজে উঠেছে। ডোমিনো মুখোশের আড়ালে চলেছে নাচ, অথবা

দেহ মিলন। পরের দিন সকালে তারা আর বলতে পারবে না, কোন্ ছেলে বা মেয়ে কোন্ ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে শরীর শরীর খেলা খেলেছে।

এলিজাবেথ ভাবে, গাঁয়ের সবাই যেন দ্য গার্ডসম্যান নাটকে অভিনয় করে চলেছে। পানট মুরায় স্থানীয় লোকেরা খোলা আকাশের নীচে বসে আগুন জ্বেলে ভেড়ার মাংস ঝলসে নিচ্ছে।

ওরা তাকে উপহার দিল-সীড়া ময়দায় ঢাকা ছাগলের দুধের পানীয়, ওপরে গরম মধু এবং সেলিমে এক ধরনের সাদা মদ। এই মদ কোথাও পাঠানো যায় না, নষ্ট হয়ে যায়। তাই পৃথিবীর আর কোথাও এটা পাওয়া যায় না।

বড়োলোকের ছেলেরা আসে পোরটো সারভোর রেড লায়ন সরাইখানায়। তারা লিজাকে আমন্ত্রণ জানায়। সাঁতার ও ঘোড়ায় চড়ার পার্টিতে আসতে বলে। লিজার বাবা বলে, পাত্র হিসেবে ওরা ভালো। তবে লিজা ওদের পছন্দ করে না। ওরা মদ খায় বেশি, বড্ড বেশি কথা বলে, শরীরে শরীর ছোঁয়াতে চায়। তারা জানে, রফ পরিবারের উত্তরাধিকারিনী সে। তাই তারা তার সঙ্গ কামনা করে, তাকে মদ ও ডিনার খাওয়ায়, বিছানায় তুলতে চায়। ওদের ধারণা, লিজার কুমারীত্ব এখনও অটুট আছে। তারা তার কৌমার্য হরণ করে ভালোবাসা পেতে চায়। ওরা চেষ্টা চালিয়ে যায়, লিজা ওদের আশাভঙ্গ করে না।

সন্ধ্যা শেষে

–চলো, আমরা বিছানায় যাই।

না। লিজা জবাব দেয়।

ওরা লিজাকে বুঝে উঠতে পারে না। মেয়েটা সুন্দরী এবং নিশ্চয়ই বোকা। কিন্তু ওরা জানে না, সুন্দরী মেয়েরাও বুদ্ধিমতী হয়। ওদের সঙ্গে মিশতে লিজার ভালো লাগে না, একঘেয়ে লাগে। তবু বাবাকে খুশি রাখার জন্য তাকে ওদের সঙ্গে বেড়াতে যেতে হয়।

একদিন রিস উইলিয়ামস এল সার্ডিনিয়ার ভিলাতে।

বাঃ, ভারী সুন্দরী হয়ে উঠেছে তো মেয়েটা!

স্যাম, রিস বলে, দিন দিন যা সুন্দরী হয়ে উঠছে লিজা, কোনদিন না আমাদের ছেড়ে চলে যায়। অবশ্য ছেলেরা যদি বোবা কালা বা অন্ধ না হয় ।

স্যাম ও রিস্ নতুন ফ্যাক্টরিতে কোন্ ওষুধটা বেশি বিক্রি হচ্ছে, কোন্টা কম, অন্য কোম্পানি কোথায় খোলা হবে, নতুন প্ল্যান চাই ইত্যাদি ব্যবসায়িক কথাবার্তা বলে, যা লিজার কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়।

স্যাম টাওয়ার রুমে কাজে ব্যস্ত। লিজাকে সঙ্গী করে রিস্ রেড লায়ন রেস্তোরাঁয় এল। সেখানে ছেলেদের সঙ্গে ওকে তীর ছোঁড়া প্র্যাকটিস করতে দেখে লিজা ভাবল, যে-কোনো জায়গায় নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে রিস্ উইলিয়ামস।

স্কুলের ব্যাপার নিয়ে ওদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা হল।

রিস বলল–স্কুলের পালা শেষ করে কী করবে ভেবেছ? বিয়ে? না–

–ভেবে দেখিনি।

.

অবশেষে লিজা কৌমার্য হারাল। এর জন্য দায়ী রিস উইলিয়ামস।

শনিবার সন্ধ্যাবেলা, বড়ো পার্টির আয়োজন করেছে তার বাবা। সবচেয়ে সুন্দর পোশাকটা পরতে রিস্ তাকে অনুরোধ করেছিল। বলেছিল, একজনকে দেখাব।

লিজা খুশি হয়েছিল। আজ সন্ধ্যায় ওর সঙ্গিনী হব।

অথচ রিস্ এক সুন্দরী ইতালিয়ান মেয়েকে সঙ্গিনী করেছে। লিজা রেগে গেল–রিস তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে মাঝরাতে পার্টি ছেড়ে চলে গেল। বাকি রাতটা ভ্যাসিলভ নামের এক দাড়িওলা মাতাল রাশিয়ান পেন্টারের সঙ্গে এক বিছানায় কাটালো।

তবে মিলনটা সুখের হয়নি। এলিজাবেথ ভীতু। আর মাতাল ভ্যাসিলভ? সে আদরের তোয়াক্কা করে না। উলঙ্গ হয়ে শুয়ে পড়ল এলিজাবেথের নগ্ন শরীরের ওপর। কেটে গেল একটি ক্ষণ। তখন ভ্যাসিলভের লম্বা পুরুষাঙ্গ ঢুকে গেছে লিজার গোপন ত্রিকোণ সুড়ঙ্গের ভেতরে। আঃ, কী দারুণ অনুভূতি! ভালোই লাগল। লিজা ভাবল, এর মতো আশ্চর্য আনন্দ দানকারী জিনিস আর নেই।

মিলনের চরম মুহূর্তে মাতাল ভ্যাসিলভ একটু কেঁপে উঠল-শিহরণে। তারপরেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। তার নাক ডাকা শোনা গেল।

নিজের প্রতি কেমন ঘেন্না হয় এলিজাবেথের। একেই কি যৌন সঙ্গম বলে? একে কেন্দ্র করেই গান, কবিতা, গল্প লেখা হয়? রিসকে মনে পড়ে। কান্না উঠে আসে। পোশাক পরে সে বাড়ি ফিরে যায়।

পরের দিন ভ্যাসিলভ আবার ফোন করল। লিজা রফ হাউসকিপারকে বলল, বলে দাও আমি বাড়ি নেই।

লিজার স্কুলে ফিরে যাওয়ার দিন এগিয়ে এল। স্যাম রফ ও রিস্ উইলিয়ামস তাকে স্কুলে ফিরিয়ে দিয়ে এল। স্যাম রফের প্রাইভেট প্লেন-বড়ো বড়ো দুটো বেডরুম, সাজানো গোছানো, বাথরুম, অফিসঘর, বসার ঘরদামি দামি ছবি ঝুলছে, সামনে একটা গ্যালি। লিজার মনে হয়, এ যেন সিন্দাবাদের ম্যাজিক কার্পেট, প্লেন নয়।

রিস্ ও লিজা দাবা খেলল। খেলা ড্র হল।

রিস্ বলল–আমি অভিভূত!

লিজা খুশি হল।

.

স্কুলের শেষ কয়েকটা মাস খুব তাড়াতাড়ি কেটে গেল। এলিজাবেথ ঠিক করল, পূর্ব পুরুষ স্যামুয়েল রফের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবে, ঠিক তার মায়ের মতো। তার। মা অতিথিদের দেখাশোনা করত। সে তার মায়ের স্থান নেবে হোস্টেসের ভূমিকায়।

এইভাবে শুরু হবে।

.

১১.

লিজা নাচছিল। কে যেন তার পাছায় চিমটি কাটল। সুইডিশ রাষ্ট্রদূত। তক্ষুনি সে যেন নাচের স্টেপ ফেলতে ভুল করেছে, এমন ভঙ্গিমাতে তার জুতোর ধারালো হিলের খোঁচা দিল রাষ্টদূতের পায়ে। লোকটা যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল।

-সরি অ্যামবাসাডর। আপনার জন্য ড্রিঙ্কস নিয়ে আসছি।

এখন লিজের দায়িত্ব–রফ অ্যান্ড সন্সের প্রত্যেকটি পার্টিতে অতিথিদের আপ্যায়ন করা। রাষ্ট্রদূত, সিনেটর, মন্ত্রী, ব্যবসায়ীদের আনাগোনা। কোটি কোটি ডলারের লেনদেন। ভাঙা গড়ার খেলা। কনফারেন্সে, হোটেলে, অ্যামব্যাসিতে, রাজপ্রাসাদে। আশ্চর্য এই জগৎ সম্রাট স্যাম রফ। সে সবসময় কোম্পানির স্বার্থের কথা চিন্তা করে। ব্যক্তিগত প্রয়োজন নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই।

.

আঠারো বছর বয়সে লিজা গ্র্যাজুয়েট হয়ে ফিরে এল। বীকম্যান প্লেসে।

তখন স্যাম আর রিস্ ব্যবসায়িক আলোচনায় ব্যস্ত।

বাবা বলল–স্কুলের পাট চুকে গেল? ভাল।

রিস বলল–গ্র্যাজুয়েশনের উৎসবে স্যামের যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। সময় পায়নি।

এলিজাবেথ বুঝল, বাবার যা বলার, রিস্ তা বলে দিচ্ছে। তার মানে বাবা তাকে ভালোবাসে না। সে যদি ছেলে হত, তাহলে বাবা তাকে গুরুত্ব দিত।

রিস বলল–স্যাম, শনিবার রাতের পার্টিতে লিজা হোস্টেস হবে।

স্যামের চোখে উৎসাহের ঝিলিক। উঠতি যুবতী সুন্দরী মেয়ে অতিথিদের ঠিকমতো.. দেখভাল করতে পারলে কোম্পানির লাভ।

স্যাম মুখে বলল তোমার পার্টির পোশাক আছে? না থাকলে কিনে নাও। পার্টি দিতে জানো?

-হ্যাঁ, এলিজাবেথ আমতা আমতা করে বলল, স্কুলে শিখেছি।

–ঠিক আছে। সৌদি আরবের কিছু শেখ আসবে।

কত জন রিস?

–চল্লিশ জন। দু-একজন এদিক-ওদিক হতে পারে।

রিস্ হাসছিল।

–আমার ওপর ভরসা রাখতে পারো। লিজার কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস।

.

এবং ঘটে গেল এক বিশ্রী কাণ্ড।

ডিনারের মেনুতে লিজা রেখেছিল কাঁকড়ার ককটেল, শুয়োরের মাংসের ক্যাসুলেট আর দামি মদ।

লিজা জানত না, সৌদি আরবের মুসলমান শেখরা কাঁকড়া বা শুয়োর কোনোটাই স্পর্শ করে না।

সে যাত্রা রিস্ লিজাকে বাঁচাল। সে টেলিফোন করল কাকে যেন। তারপর অতিথিদের সঙ্গে গল্পে মেতে রইল।

টেবিল পাতা হল। দেখা গেল, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েকটা ক্যাটারিং ট্রাক বাড়ির সামনে হাজির।

ভেড়ার মাংস, ভাত, রোস্ট চিকেন, মাছ, মিষ্টি, পনির, টাটকা ফল। সবাই তৃপ্তি করে খেল। লিজা রিসের দিকে তাকাচ্ছে আর একটু একটু খাবার মুখে দিচ্ছে।

পার্টি শেষ হল।

লিজা বলল–বাবা, আমারই ভুল। দুঃখিত। রিস্ না থাকলে

–আশা করি, আর ভুল হবে না। স্যাম সরাসরি বলল।

সত্যি, তারপর থেকে লিজার আর ভুল হয়নি। সে অতিথিদের প্রত্যেকের ব্যাপারে ফাইল কার্ড রাখত নিজের কাছে। তাদের পছন্দ-অপছন্দ জেনে নিত। অতিথিরা পছন্দসই ব্রান্ডের মদ বা হুইস্কি বা চুরুট পেয়ে খুশি হত।

সুদর্শন যুবক রিস উইলিয়ামস বেশির ভাগ পার্টিতে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করে। সুন্দরী যুবতী মেয়েরা সঙ্গে থাকে। ওরা কী সুন্দর চুল বাঁধে, সুন্দর সাজে। লিজা পারে না। রিস কিন্তু এসব ব্যাপারে নজর দেয় না।

.

সেদিন লিজার জন্মদিন, কুড়ি বছর পূর্ণ হল তার।

ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসে তার বাবা বলল রাতে থিয়েটারের টিকিট কাটা আছে। তারপর আমরা ডিনার পার্টিতে যাব।

লিজা খুশি। তাহলে তার জন্মদিনের কথা বাবার মনে আছে।

পরক্ষণেই সে শুনল, বাবা বলছে–মোট বারোজন। বলিভিয়ার কনট্রাক্টের ব্যাপারে আলোচনা আছে।

লিজা দুঃখ পেল, জন্মদিনের কথা বাবা কিছু বলল না।

সন্ধ্যা ছটা। লিজার হাতে মস্ত বড়ো ফুলের তোড়া নিশ্চয়ই বাবা পাঠিয়েছে।

ফুলের তোড়ার সঙ্গে একটা কার্ড বাঁধা সুন্দরী মেয়ের জন্য কী সুন্দর দিন! রিস্।

সন্ধ্যা সাতটা। বাবা থিয়েটারে যাচ্ছে। তার আগে ফুলের তোড়াটা দেখে বলল নিশ্চয়ই বয়ফ্রেন্ড পাঠিয়েছে?

লিজা বলতে চেয়েছিল, জন্মদিনের উপহার। কিন্তু সে চুপ করে রইল। মেয়ে না হয়ে ছেলে হলে বাবা নিশ্চয়ই তার জন্মদিনটা উপভোগ করত।

বাড়িতে লিজা একা। যন্ত্রণা ও নৈরাশ্য তার সঙ্গী।

দশটা বাজে। রিস্ এল, বলল–হ্যাপি বার্থডে। পোশাক পরে নাও। আমরা ডিনারে যাব।

ওরা লং আইল্যান্ডের একটা রেস্তোরাঁয় এল–ফ্রেঞ্চ ফ্রাই পিঁয়াজ, রুট বিয়ার। রিস্ শুধু মেয়েদের পছন্দ করে না। ওর সঙ্গে যখন যে থাকে, মনে হয় সে বুঝি রিসের আপনজন, আত্মার আত্মীয়, বিশেষ কেউ।

লিজা শুনেছে, রিসের ফেলে আসা দিনযাপনের গল্প। অদ্ভুত, সুন্দর, আনন্দপূর্ণ অ্যাডভেঞ্চারের গল্প।

রিস্ বলেছে–ছোটো থেকে সবকিছু দেখার, জানার একটা প্রবল ইচ্ছা ছিল। তাই একদিন বাড়ি থেকে পালালাম। ওয়েলসের পার্কে আর বীচে কাজ করতাম। গ্রীষ্মকালে কোর্যাল-এ করে রোসিলির বুকে ট্যুরিস্টদের নিয়ে যেতাম।

–রোসিলি? কোর‍্যাকল?

–হ্যাঁ, রোসিলি হল একটি খরস্রোতা নদী। কোর্যাকল হল প্রাক-রোমান যুগের ডিঙি নৌকো; কাঠ ও চামড়ার তৈরি। ওয়েলসে গেলে তোমারও ভালো লাগবে। সেখানে আছে। ভেল অফ নীথ-এ পাগলাঝোরা, অ্যাবরেডডি, ক্যায়েরবডি, পোর্থক্লেজ, বিলগেট্টি, ল্যাংগওম উচাফ।

কী সুন্দর জায়গার নাম! যেন সংগীতের এক-একটি মূর্ছনা।

বন্য এক দেশ। ওখানে আছে জাদু, আছে বিস্ময়।

–তা হলে তুমি ওয়েলস ছাড়লে কেন?

–ছোট্ট বাসনা। পৃথিবীর অধীশ্বর হওয়ার বাসনা।

আজও রিস্ উইলিয়ামস একই ক্ষুধার তাড়নায় ছুটে বেড়াচ্ছে।

.

লিজা লক্ষ করেছে, লক্ষ-কোটি ডলারের লাভ-লোকসান, হাজার হাজার মানুষের জীবন নির্ভর করছে তার বাবার একটা সিদ্ধান্তের ওপর। নানা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানরা ছুটে আসে তার বাবার কাছে নতুন কারখানা খুলতে হবে, পুরোনো কারখানা বন্ধ করে দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

-বাবা, এ তো অবিশ্বাস্য! তুমি যেন গোটা দেশের শাসনকর্তা!

বাবার ঠোঁটে হাসিরফ অ্যান্ড সন্সের আয় পৃথিবীর শতকরা পঁচাত্তর ভাগ দেশের প্রত্যেকটির জাতীয় আয়ের থেকেও বেশি।

রফ অ্যান্ড সন্সের বোর্ড অফ ডাইরেক্টরদের সঙ্গে লিজের পরিচয় হয়েছে।

রোমে সিমনেস্তা ও ইভো পালাজজি। রফ অ্যান্ড সন্সের ইতালীয় শাখার পরিচালনার দায়িত্বে আছে সুপুরুষ হাসিখুশি ইভো পালাজজি। উন্নতি করেছে যথেষ্ট। খোলামেলা মনের।

–প্যারীতে আছে হেলেন রফ মারতেইল আর তার স্বামী শার্ল মারতেইল। রফ অ্যান্ড সন্সের প্যারী শাখার দায়িত্বে আছে শার্ল।

বাবার মুখে শুনেছে, শার্ল কর্মঠ, কিন্তু উদ্যোগী নয়।

লিজের ধারণা, ব্যবসা চালানোর ব্যাপারে স্ত্রী হেলেন তাকে উপদেশ দেয়।

জার্মানিতে আছে অ্যানা রফ ও তার স্বামী ওয়ালথার গ্যাসনার। অ্যানা বেশি কথা বলে না। জীবন সম্পর্কে ভীতি আছে তার। ওয়ালথার সুপুরষ, সুদর্শন। লিজা ভাবে, নিশ্চয়ই ও ওর বউকে খুব ভালোবাসে।

সবথেকে ভালো রফ পরিবারের মেয়ে স্যার অ্যালেক নিকলসের মা। ওর বাবার নাম স্যার জর্জ নিকলস্। অ্যালেক খুব ভালো ও ভদ্র।.ওর একটা নরম মন আছে। লিজাকে–সে উপদেশ দেয়। লিজা তা গ্রহণ করে।

একবার চূড়ান্ত হতাশায় বাড়ি ছেড়ে পালাবে ঠিক করল লিজা। না, তার আগে অ্যালেকের সঙ্গে কথা বলা দরকার। একঘন্টা ধরে তারা ফোনে কথা বলেছিল। পরিণতি মনে মনে লিজা তার বাবাকে ক্ষমা করে দিল।

অ্যালেকের বউ ভিভিয়ান। সে সুন্দরী, কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক। গ্লাউসেস্টারশায়ারে ওরা গিয়েছিল উইকএন্ডে পিকনিক করতে। ফিরে এসে ভিভিয়ান তার স্বামীকে বলল–আমি আর পারছি না তোমার ওই দূর সম্পর্কের বোনের দেখাশোনা করতে। আমি বড়োই ক্লান্ত। লন্ডনে একটা এনগেজমেন্ট আছে সেখানে যাচ্ছি।

লিজা শুনেছে সব।

–তুমি এটা বাতিল করতে পারো না! ও তো সারা জীবন এখানে থাকবে না। আর মাত্র একটা দিন। প্লিজ, ভিভ।

-সরি, অ্যালেক। আমার পেষণ চাই, জবরদস্ত পেষণ। ওখানে আজ রাতেই তা পেয়ে যাব।

–যিশুর দোহাই।

অ্যালেক, ওটা তোমার কাছেই রেখে দাও। আমাকে আমার মতো চলতে দাও।

এলিজাবেথের আতঙ্কিত মুখ।

ভিভিয়ান বলল–এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে? তারপর সে ওপরের ঘরে চলে গেল।

পাইপে অগ্নি সংযোগ করতে করতে অ্যালেক বলল–ভিভিয়ানকে ভুল বুঝো না। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে শারীরিক চাহিদা নিয়ে কত ঝামেলা হয়। আমি ওর সঙ্গে পেরে উঠি না। ও বেচারীর কোনো দোষ নেই। আমি জানি, ও অন্য পুরুষকে বিছানায় নিয়ে যায়। তবু ওকে আমি ত্যাগ করতে পারি না। ওকে যে আমি বড্ড ভালোবাসি!

সেই মুহূর্তে অ্যালেককে খুব ভালো লাগছিল এলিজাবেথের।

.

কিছুদিন ধরে স্যাম রফ খুব চিন্তিত। কারণ কী?

–ছোট্ট একটা সমস্যা মেটাতে হবে আমাকে। তুমি পরে জানতে পারবে।

লিজা লক্ষ করেছে তার বাবাকে, চিন্তিত ফ্যাকাশে মুখ। রোগা হয়ে গেছে।

বাবা সুইজারল্যান্ডে যাবে পাহাড়ে চড়তে-খবরটা শুনে লিজা সত্যিই খুশি হয়েছিল।

–তোমার রিজারভেশন?

হয়ে গেছে।

এটাও অস্বাভাবিক। পরের দিন বাবা সুইজারল্যান্ডে চলে গেল। আর ফিরে এল না। ওই শেষ দেখা। আর জীবনে–

.

অন্ধকার ঘর। বেডরুমে শুয়ে আছে এলিজাবেথ। অতীতের কত কথাই স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠছে। বাবা মারা গেছে। অবিশ্বাস্য! স্যাম রফের কোনো পুত্রসন্তান নেই। এখন কী হবে?

তখনই উকিলের চিঠি পায় লিজা

তোমার বাবার সব সম্পত্তি এবং রফ অ্যান্ড সন্সের বেশির ভাগ শেয়ারের একমাত্র মালিক তুমি। তোমার বাবা সেইভাবেই উইল করে গেছে। স্যাম আশা করেছিল, সে অন্তত আরও পনেরো দিন বাঁচবে। না হলে সে অন্য কাউকে তার জায়গায় কোম্পানির ডাইরেক্টর করে উইল করে যেত হয়তো। বর্তমানে স্যামের পরিবর্তে তুমিই রফ অ্যান্ড

সন্সের ডাইরেক্টর। তুমিই এই কোম্পানির প্রথম মহিলা ডাইরেক্টর। শুক্রবার জুরিখে বোর্ড মিটিং আছে। তোমাকে আসতে হবে।

-হ্যাঁ, আমি যাব। এলিজাবেথ মনে মনে বলে।

৩. পর্নো ফিল্মের শুটিং

দ্বিতীয় পর্ব

০১.

পর্তুগাল। বুধবার, ৯ই সেপ্টেম্বর, মধ্যরাত।

রুয়া দস রমবেইরস। বিপজ্জনক আঁকাবাঁকা গুলি। গলির ধারে ছোট্ট ফ্ল্যাট, ভাড়া করা। সেখানে পর্নো ফিল্মের শুটিং শুরু হয়েছে।

ঘরে চারজন লোক।

ক্যামেরাম্যান, অভিনেতা ও অভিনেত্রী এবং একজন দর্শক।

তরুণী অভিনেত্রী, মাথায় সোনালি চুল, চমৎকার চেহারা, গলায় লাল রিবন, পরনে একটা সুতোও নেই।

পুরুষ অর্থাৎ অভিনেতাও উলঙ্গ। বলিষ্ঠ চেহারা। চওড়া কাঁধ, বিশাল বুক, লোমহীন, মস্ত বড়ো পুরুষাঙ্গটা শিথিল হয়ে পড়ে আছে।

ওরা বিছানায়।

দর্শকটির চোখে মস্ত বড় সানগ্লাস, মাথায় ইয়া বড়ো একটা টুপি। ছায়ায় বসে আছে।

দর্শক ঘাড় নাড়ল। ক্যামেরাম্যান চালু করল তার পর্নোফিল্মের ক্যামেরা।

অভিনেতা অভিনেত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল–তবে শুটিং শুরু হোক।

পুরুষটি ঝুঁকল মেয়েটার ওপর।

এখন তার পুরুষাঙ্গ তরুণীর মুখের ভেতর। সে লজেন্সের মতো সেটা চোষে। সেটা শক্ত হয়ে ওঠে। সে মুখ সরায়–ওঃ জেসাস! সাইজ দেখো না!

ক্যামেরাম্যান হুকুম দিল–হীরা, এবার ওটা ঢোকাও।

পুরুষটি মেয়েটির দিকে গড়িয়ে গেল। পুরুষাঙ্গ ওর দু পায়ের ফাঁকে রাখে।

মেয়েটা ক্ষেপে গেল–হনি, আস্তে।

-কেন তোমার ভালো লাগছে না?

কী করে ভালো লাগবে? লম্বায় চওড়ায় তোমার ওটা তো কম বড়ো নয়।

ছায়ায় বসে থাকার দরুন এবং টুপি ও রোদ চশমার জন্য পর্নোফিল্মের শ্যুটিং-এর দর্শককে চেনা যাচ্ছে না। নায়ক যখন নায়িকার গোপন ত্রিকোণের গভীরে পুরুষাঙ্গ দিয়ে চাপ দিল, তখন সে ঝুঁকে পড়ল। তার নিঃশ্বাস গরম হয়ে উঠেছে।

নায়িকা বলল–আঃ, দারুণ ভালো লাগছে। তবে বেবি, একটু সামলে।

দর্শক তখন ভাবছে, এই নিয়ে তিন-তিনটে মেয়েকে এই অবস্থায় দেখলাম। এই মেয়েটা ওই দুটোর থেকেও বেশি সুন্দরী।

শোনা গেল শীৎকারের আওয়াজ। পুরুষের কোমর জাপটে ধরে মেয়েটা নিজের দিকে টেনে নিচ্ছে। আর বলছে–আঃ, কী আরাম! প্লিজ, চালিয়ে যাও।

পুরুষ আরো জোরে জোরে চাপ দিতে থাকল। কোমর দ্রুত হাঁপরের মতো ওঠা নামা করছে। মেয়েটার কোমরের ওঠানামার গতি তার চেয়েও বেশি। সে পুরুষের পিঠে নখের আঁচড় বসিয়ে দিয়েছে।

–ওহ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি শেষ হয়ে গেছি!

চরম পুলকের সেই ক্ষণে দর্শকের দিকে তাকাল ক্যামেরাম্যান। কালো চশমার আড়ালে দর্শকের চোখ দুটি জ্বলছে। ক্যামেরাম্যান ইঙ্গিত পেয়ে পুরুষটিকে বলল–এবার।

নায়িকা তখন চরম আনন্দে শিহরিত, চোখেমুখে উন্মাদনা।

এবার নায়ক তার শক্ত মুঠিতে চেপে ধরল নায়িকার গলা। নায়িকার চোখে বিস্ফারিত আতঙ্ক আর বিস্ময়।

কালো চশমার আড়াল থেকে দর্শক মনে মনে এই দৃশ্য উপভোগ করতে থাকে। জেসাস! মেয়েটির চোখদুটো কত বড় হয়ে উঠেছে! সাঁড়াশির মতো দুটি হাতকে সে ছাড়াতে

চাইছে। তখন মেয়েটির চোখে যৌন মিলনের চরম মুহূর্তের চরম পুলক ও মৃত্যু যন্ত্রণার বিভীষিকা মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। দর্শক ঘামছে, পোশাক ভিজে গেছে। কী সুন্দর, কী উত্তেজক!

তারপরেই সব শেষ। দুঃসহ আনন্দে দর্শকের শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। মেয়েটাকে শাস্তি দিতে পেরেছে সে। সহসা সে নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিস্পর্ধী ভাবল।

.

০২.

জুরিখ। শুক্রবার। ১১ই সেপ্টেম্বর। দুপুর।

জুরিখের পশ্চিম প্রান্ত। ষাট একর জায়গা জুড়ে রফ অ্যান্ড সন্সের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস। বারো তলা বিল্ডিং। রিসার্চ বিল্ডিং, এক্সপেরিমেন্টাল ল্যাবোরেটরি ছাড়াও আছে প্ল্যানিং ডিভিশন। আধুনিক ডেনিশ ফার্নিচার, সবুজ ও সাদা রঙের। কাঁচের ডেস্কের পেছনে রিসেপশন। লবির ডানদিকে লিফট, একসারি। কোম্পানির প্রেসিডেন্ট এক্সপ্রেস লিফট ব্যবহার করে। আজ প্রেসিডেন্ট বেঁচে নেই। ওই লিফট বোর্ড আফ ডাইরেক্টরস-এর সদস্যদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। প্লেন, ট্রেন, হেলিকপ্টার ও লিমুজিনে চড়ে তারা এসেছেন বিশ্বের নানা দেশ থেকে। আছেন স্যার অ্যালেক নিকলস, ওয়ালথার গ্যাসনার, ইভো পালাজজি ও শার্ল মারতেইল।

এখানে রিস উইলিয়ামসও উপস্থিত। অবশ্য সে বোর্ডের সদস্য নয়।

রিফ্রেসমেন্ট ও ড্রিঙ্কের অঢেল ব্যবস্থা। অবশ্য কেউ তাতে হাতও দিচ্ছে না। সবার মনে তখন টান টান উত্তেজনা। সকলেই চিন্তিত।

মৃত স্যাম রফের পারসোনাল সেক্রেটারি কেট আরলিং বলল–মিস রফ এসে গেছে।

পেন, নোটপ্যাড, রুপোর ক্যারাফেয় জল, সিগার, সিগারেট, অ্যাশট্রে, দেশলাই সব ঠিক ঠিক জায়গায় আছে কিনা চকিত দৃষ্টিতে দেখে নিল আরলিং।

এলিজাবেথ রফ গাড়ি থেকে নামল। পরনে কালো স্যুট, সাদা ব্লাউজ। তাকে ঘিরে ধরল টিভি, রেডিও, খবরের কাগজের রিপোর্টাররা। ফটোগ্রাফারের হাতে ক্যামেরা।

–মিস রফ, আমি লা ইউরোপের রিপোর্টার, এখন কোম্পানির প্রেসিডেন্ট কে হচ্ছেন?

মিস রফ, এদিকে তাকান আপনার মিষ্টি হাসি আমাদের পাঠকরা দেখতে চায়।

–অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, প্লিজ মিস রফ, আপনার বাবার উইল সম্বন্ধে কিছু বলুন?

–আমি নইয়র্ক ডেলি নিউজ থেকে আসছি। যতদূর শুনেছি আপনার বাবা একজন পাক্কা পবর্তারোহী ছিলেন। তাহলে কী ভাবে

–ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল। বর্তমানে কোম্পানির আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলুন?

লন্ডন টাইমস। রফ অ্যান্ড সন্স সম্পর্কে আমরা কাগজে একটা প্রবন্ধ ছাপতে চাইছি।

আর একটা ফটো প্লিজ।

তিনজন সিকিউরিটি গার্ড ছুটে এসেছে। ভিড় ভেদ করে এলিজাবেথ রফকে তারা লিফটে ভরে দিল।

বোর্ডরুমে পা রাখল এলিজাবেথ রফ।

–আমি দুঃখিত এলিজাবেথ। স্যার অ্যালেক নিকলস বলে উঠল।

–তোমাকে ফোন করেছিলাম

ইভো পালাজজি তার গালে দুটি চুমুর চিহ্ন এঁকে দিল–ভালো আছ?

হেলেন ও আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। শার্ল মারতেইল বলল।

এবং ওয়ালথার গ্যাসনার?

–অ্যানা ও আমিও সমবেদনা জানাচ্ছি।

–তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

এই ঘরে স্যামের অস্তিত্ব সবখানে। মেয়েটা কান্নায় ভেঙে পড়তে পারে। একথা ভেবে রিস্ উইলিয়ামস হাত বাড়িয়ে দিল

–হ্যালো লিজ।

–হ্যালো, রিস।

সবাই এসে গেছে। মিটিং শুরু হল।

শার্ল অ্যালেককে শুরু করার নির্দেশ দিল।

বোতাম টিপল অ্যালেক। নোটবুক হাতে ঘরে এসে ঢুকল আরলিং, একটা চেয়ারে বসল।

অ্যালেক বলতে শুরু করল-স্যামের মৃত্যুতে আমাদের প্রত্যেকের ক্ষতি হয়েছে। জনসাধারণের কাছে আমাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হতে দেওয়া যাবে না।

–ঠিক! শার্ল চাপা গর্জন করে উঠল, প্রেস আমাদের সম্বন্ধে ইদানিংকালে যা নয়, তাই লিখছে, বলছে।

কারণ? এলিজাবেথের প্রশ্ন।

–কোম্পানির সামনে এখন হাজারও সমস্যা। রিস্ তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল। মামলা, সরকারি তদন্ত, ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যাঙ্কের চাপ। কোম্পানির ওপর পাবলিকের আস্থা আছে। তাই ওষুধ বিক্রি হয়। সেই বিশ্বাস বা আস্থা যদি নষ্ট হয়, তাহলে আমাদের প্রতিষ্ঠান ডুবে যাবে।

–সমস্যার সমাধান আছে, ইভো বলল।

–শুনি, কেমন সমাধান।

–আমাদের স্টক আমরা পাবলিকের কাছে বিক্রি করব। ওয়ালথারের প্রস্তাব। তাহলেই ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধ হবে। এর পরেও আমাদের হাতে প্রচুর টাকা থাকবে। বারোটি আন্তর্জাতিক ব্রোকেজ ফার্ম এই স্টক ইস্যু আনডাররাইট করতে রাজি আছে। আমরা স্টকের যে দাম চাইব, ওরা ওর গ্যারান্টার হবে। ব্যাঙ্ক ও ইনসিউরেন্স কোম্পানি বেশি শেয়ার কিনবে।

–তাহলে তো কোম্পানি ওদের পরিচালনাধীন হয়ে যাবে!

–আমরাও বোর্ড অফ ডাইরেক্টরসে থাকব।

এলিজাবেথ বলে উঠল–তোমরা-সবাই দেখছি, পরিবারের বাইরে শেয়ার বিক্রি করতে রাজি। তাহলে আগে কেন এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি?

কয়েক মিনিটের নীরবতা।

–একাজ করতে গেলে সকলকে একমত হতে হয়। ইভো বলল।

–কে মত দেয়নি?

–স্যাম রফ। রিস্ জবাব দিল।

এলিজাবেথ বুঝল, স্যাম রফের মৃত্যুতে এরা সকলেই খুশি। শোক, দুঃখ, সমবেদনা, সহানুভূতি, এগুলো সব ভড়ং। কাগজপত্র সব তৈরি, কেবল লিজার সইয়ের অপেক্ষা।

মনে পড়ে গেল এলিজাবেথের, স্যামুয়েল রফের উক্তি-শেয়ালকে কখনও বিশ্বাস করতে নেই। একবার তাকে মুরগির ঘরে ঢুকতে দিলে আর রক্ষে নেই।

ইভো বলল–তুমি এসব বোঝো না। এটাই ভালো।

–স্টক বেশি হলে টাকা পাবে প্রচুর, জীবনে খরচ করে কূল পাবে না। ওয়ালথার। বলল।

শাল বলছে–এলিজাবেথ, খামোখা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। এটা মেনে নাও। দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

পথ আছে, লিজ মনে মনে বলল।

–আমি এখন কিছু বলতে পারছি না। ভেবে দেখতে হবে।

কত দিন?

–আমরা–

রিস্ বাধা দিল–কোম্পানির সমস্যাগুলো আগে ওকে বুঝতে দাও, তারপর মনস্থির করবে।

অ্যালেক দ্বিমত করল না।

শার্ল নিস্পৃহ গলায় বলল–এলিজাবেথ যা বলবে তাই হবে।

–ডারলিং, বেশি দেরি কোরো না। ইভো বলল।

সবাই যখন নিজের নিজের স্বার্থ সামলাতে ব্যস্ত, তখন কেবল একজন ভাবছিল–হায় জেসাস, এ মেয়েটাও আর বেশি দিন বাঁচবে না।

.

০৩.

জুরিখে রফ অ্যান্ড সন্সের সদর দপ্তর। অফিসে মিসেটের ল্যান্ডস্কেপ, রেনোয়া শাগাল, পল ক্লীর আঁকা পেন্টিং।

শ্যাময় চামড়ার কৌচ, কফি-বটবল, ইজিচেয়ার, ফায়ার প্লেস।

কালো মেহগনি কাঠের ডেস্ক।

কনসোল টেবিল, লাল ফোন, ইন্টারকম।

ডেস্কের পেছনে একটা পোর্ট্রেট, রফ অ্যান্ড সন্সের প্রতিষ্ঠাতা-স্যামুয়েল রফ।

ভেতরে ড্রেসিংরুম। এখন বাবার পোশাক ইত্যাদি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। স্যনা, জিমন্যাসিয়াম, সেলুন, ডাইনিং রুম।

তোমার ভাবমূর্তি দেখে মিটিং-এ সবাই চমকে গেছে। রিস্ বলতে থাকে, কাগজপত্র সই হবে বলে সকলে তৈরি, কিন্তু তুমি সই করলে না। কেন লিজা? স্যামুয়েল রফ অর্থাৎ তোমার পিতৃপুরুষ চেয়েছিলেন, এই প্রতিষ্ঠান যেন পাবলিক কোম্পানি না হয়ে যায়। কিন্তু তখন এই কোম্পানি খুবই ছোটো ছিল। তৈরি হত কেবল ওষুধ। অথচ আজ? আজ বিশ্বের নানা দেশে এর শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে পড়েছে। ওষুধের পাশাপাশি রফ অ্যান্ড সন্স কেমিক্যাল, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেয়ার স্প্রে, কীটনাশক ওষুধ, অ্যাডহেসিভ, কসমেটিক, বায়োইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, প্লাস্টিক এক্সপ্লোজিভ, ডাক্তারদের জন্য মেডিকেল ম্যাগাজিন, বেবিফুড, পশুখাদ্য প্রস্তুত করছে। সমস্ত শাখা-অফিসগুলো রিপোর্ট পাঠায় এই অফিসে। একটা ঘোড়া আর গোটা কয়েক টেস্টটিউব নিয়ে রফ অ্যান্ড সন্সের পথ চলা শুরু হয়েছিল। আজ তা বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে। ষাটটা ফ্যাক্টরি, দশটা রিসার্চ সেন্টার, হাজার হাজার সেলসম্যান, সম সংখ্যক মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। গত বছর শুধু আমেরিকাতে চোদ্দো বিলিয়ন ডলারের ওষুধ বিক্রি হয়েছিল। তার বেশির ভাগ ওষুধই এই কোম্পানির।

ওষুধ রিসার্চ ও বিজ্ঞাপনের জন্য যে ফিল্ম তৈরি হয় সেখানে গিয়ে রিস্ বলল আমরা যে সংখ্যায় ফিল্ম ব্যবহার করি, বড়ো বড়ো হলিউড স্টুডিওতেও তা দেখা যায় না।

মলিকিউলার বায়লজি ডিপার্টমেন্ট। তারপর লিকুইড সেন্টার। সেখানে কাঁচের লাইনিং লাগানো স্টেনলেস স্টিলের মস্ত বড়ো বড়ো ট্যাংক, প্রায় পঞ্চাশটা। সেগুলো সিলিং

থেকে ঝুলছে। তরল ওষুধ এখানে বোতল বন্দি করা হয়। পাউডার থেকে ট্যাবলেট তৈরি করার জন্য আছে ট্যাবলেট কমপ্রেম, রুম। প্রত্যেকটি ট্যাবলেটে রফ অ্যান্ড সন্স ছাপ মারা হয়।

বিজ্ঞানীদের জন্য ছোটো একটি বাড়ি। এখানে তিনশোজন বৈজ্ঞানিক কাজ করেন। আছেন অ্যানলিটিক্যাল কেমিস্ট, বায়োকেমিস্ট, অরগ্যানিক কেমিস্ট, প্যাথোলোজিস্ট। তারা অধিকাংশই পি.এইচ.ডি. ডিগ্রিধারী।

এরপর ওরা এল কোটি ডলারের ঘরে। রিস বলেছে, এখানে বন্দুকধারী পুলিশ প্রহরায় নিযুক্ত। সিকিউরিটি পাস ছাড়া কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। জানালাবিহীন ঘর। মেঝে থেকে শেলফগুলো উঠে গেছে সিলিং পর্যন্ত। থাকে থাকে বোতল, জার, টিউব সাজানো।

রিস্ বলল–এখানে সেইসব ওষুধ রাখা হয়, সেগুলো কাজের নয়। পাঁচ-দশ মিলিয়ন ডলার খরচ করে বছরের পর বছর ধরে রিসার্চ করে ওষুধটি বের করার পর দেখা গেল, অন্য কোম্পানি ওটা আগেই বাজারে নিয়ে এসেছে। তাই এই ওষুধগুলোর কোনো নাম হয় না। কেবল নম্বর দিয়ে রেখে দেওয়া হয়। এগুলো ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে ভেবে ফেলে দেওয়া হয় না। হয়তো দেখা গেল, কোনো তরুণ বিজ্ঞানী এই ওষুধের ওপর আরও রিসার্চ করে নতুন কিছু আবিষ্কার করে ফেলল।

এবার পাশের ঘরে এল তারা।

–এটার নাম ক্ষতির ঘর। রিস বলল, অবশ্য এই ক্ষতি আমরা ইচ্ছে করে হতে দিই।

–তার মানে?

–দেখো, বোতলের গায়ে লেখা বটলিজম। হ্যাম, সসেজ, টিনে রাখা খাবারে এক ধরনের জীবাণু মারাত্মক এক নিউরোটক্সিন তৈরি করে। ওই খাবার খেলে ফুড পয়জনিং বা পক্ষাঘাত হয়। একেই বলে বটলিজম। এর একটা ওষুধের পিছনে আমরা কয়েক মিলিয়ান ডলার খরচ করেছি। কিন্তু তুমি শুনে আশ্চর্য হবে যে, গতবছর সারা আমেরিকায় মাত্র পঁচিশ জন বটলিজম দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। এছাড়া এখানে জলাতঙ্কের, সাপের কামড়ের, বিষাক্ত গাছের ছোঁয়ায় বিষক্রিয়ার জন্য ওষুধ মজুত রাখা আছে। এগুলো বিক্রি হয় না। সেনাবাহিনী ও হাসপাতালগুলোতে বিনামূল্যে পাঠানো হয়।

-বাঃ, খুব ভালো ব্যাপার। লিজা বলল। তার মনে পড়ল, বুড়ো স্যামুয়েলও তাই চাইত।

রিস্ লিজাকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখাচ্ছে। কাঁচ গলানোর ফ্যাক্টরি, নতুন বাড়ি প্ল্যান করার স্থপতি কেন্দ্র, এস্টেট ডিভিশন। ছাপাখানায় অজস্র লোক কাজ করছে। প্রায় পঞ্চাশটি : ভাষায় প্যামফেট ছাপানো হচ্ছে।

স্টেরাইল রুম। লিজার মনে পড়ে গেল জর্জ অরওয়েলের বিখ্যাত উপন্যাস ১৯৮৪ র কথা। ঘরে আন্ট্রাভায়োলেট আলো। এক-একটি ঘরের ছাদ ও দেয়াল এক-একরঙের সাদা, সবুজ, নীল। সেই একই রঙের পোশাক পরেছে কর্মীরাও। স্টেরাইল রুমে ঢোকার পর কর্মীরা যে যার ঘরে প্রবেশ করে।

রিসার্চরুম। শত শত খাঁচা। বেড়াল, সাদা ইঁদুর, বাঁদর। কোনোটার মাথা ন্যাড়া, কোনোটার মাথায় ইলেকট্রোড বসানো হয়েছে। টিউমার ফুলে ফুলে আছে শরীরের এখানে সেখানে। কোনোটা ঘুমোচ্ছে, কোনোটা আবার চেঁচাচ্ছে। লিজা দেখল, একটা সাদা বেড়ালের বাচ্চার মগজ পাতলা প্লাস্টিকের আবরণে ঢেকে রাখা হয়েছে। সেখান থেকে ছটা তার বেরিয়ে আছে।

লিজা অবাক–এগুলো কী?

খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে একবুড়ো বৈজ্ঞানিক, লম্বা দাড়ি। হাতে নোটবুক। কীসব লিখছে–নতুন একটা ট্রাংকুইলাইজার নিয়ে পরীক্ষা চলছে।

কাজ হলে ভালো। রিস, এসব জন্তুগুলোকে এমন যন্ত্রণা দেওয়া কি ঠিক?

–এর ফলে কত মানুষের প্রাণ রক্ষা পায়। ১৯৫০-র পর যারা জন্মেছে, তাদের বেশির ভাগ টিকে আছে আধুনিক ওষুধের গুণে। কথাটা ভেবে দেখার।

একটা প্ল্যান্ট ঘুরে দেখতে লিজার দুদিন কেটে গেল। এরকম ডজন ডজন রফ প্ল্যান্ট আছে পৃথিবীর নানা প্রান্তে। ওরে বাবা! লিজার মাথা ঘুরছে।

নতুন একটা ওষুধ বের করতে দশ বছরের রিসার্চ লাগে।

দু-হাজারটা কম্পাউন্ড নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করলে কাজে লাগে হয়তো তিনটে।

কোয়ালিটি কনট্রোলে কর্মীর সংখ্যা প্রায় তিনশো।

সারা বিশ্বে রফ অ্যান্ড সন্সের কর্মীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ।

এ এক বিরাট মহাযজ্ঞ। চট করে লিজার মগজে ঢুকবে না। ওরা যা চাইছে, বরং তাই হোক। পাবলিকের কাছে শেয়ার বিক্রি করে দেওয়াই ভালো।

পরের দিন মিস আরলিং একটি সুটকেস লিজার হাতে তুলে দিল–পুলিশ বিভাগ আপনার বাবার সুটকেসটা পাঠিয়ে দিয়েছে।

.

০৪.

এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি ধরে লিজা সার্ডিনিয়ার ভিলায় ফিরে এল। ঘর ফাঁকা, বাবা নেই। ও বুঝি বাবার কণ্ঠস্বর শোনার জন্য উদগ্রীব হয়েছিল।

সে একটা কাগজে আপন মনে লিখল-মিসেস রিস্ উইলিয়ামস।

ট্রাংকল করল–অ্যালেক, উইক এন্ডে এখানে চলে এসো।

–ঠিক আছে।

–ভিভিয়ানকে সঙ্গে আনবে।

–ও এখন লন্ডনে ব্যস্ত। আমি একাই যাব, সকালে।

ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ, অ্যালেক। লিজা বাবার সুটকেস খুলল। কার্ডবোর্ডের কভারে কাগজগুলো বাধা। ওপরে লেখা মিস্টার স্যাম রফ, কনফিডেনশিয়াল।

কোনো কপি নেই।

রিপোর্টগুলো পড়তে থাকল সে। যত পড়ছে ততই আতঙ্কিত হচ্ছে। গত কয়েক বছরে ঘটে যাওয়া গোপন খবর।

চিলিতে রফ অ্যান্ড সন্সের কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতে বিস্ফোরণ ঘটে। বিষাক্ত গ্যাস দশ স্কোয়ার মাইল এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। বারোজন মারা যায়। একশোজন হাসপাতালে। একটা গৃহপালিত পশু পর্যন্ত বেঁচে নেই। এমনকি উদ্ভিদগুলোও ধ্বংস হয়ে গেছে। এলাকাটা এখন শ্মশানপুরীতে পরিণত হয়েছে। চিলি সরকারের অনাগ্রহী মনোভাবের জন্য প্রমাণ করা গেল না, যে, এটা স্যাবোটাজ। কেউ ইচ্ছে করে এমন অমানবিক ঘটনা ঘটিয়েছে।

আহত ও নিহতদের ছবি ছাপা হয়েছিল খবরের কাগজের পাতায়। হেডলাইনে লেখা হয়েছিল, মানুষের নিরাপত্তার কথা রফ অ্যান্ড সন্স ভাবে না। সেই প্রথম কোম্পানির ভাবমূর্তি সাধারণের কাছে নষ্ট হয়ে গেল।

পরের রিপোর্ট–চারটে গুরুত্বপূর্ণ রিসার্চ প্রোজেক্টের ওপর রফ অ্যান্ড সন্সের বিজ্ঞানীরা কাজ করছিলেন। এর জন্য পাঁচ কোটি ডলার খরচ হল। কিন্তু কোম্পানি বাজারে ওষুধ

ছাড়ার আগে দেখা গেল অন্য কোনো কোম্পানি সেই ওষুধ আগেই বের করে ফেলেছে। এটা হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে পরপর এরকম ঘটনা ঘটে যাওয়া সন্দেহ উদ্রেককারী। পৃথিবীর চারটি দেশে অত্যন্ত গোপনে রিসার্চের কাজ চলছিল। নিশ্চয়ই এর অন্তরালে কোনো চক্রান্ত আছে। কোম্পানির ওপর মহলের কোনো লোক এ ব্যাপারে অন্য কোম্পানিতে তথ্য সরবরাহ করছে।

তিন নম্বর রিপোর্ট–বিষাক্ত ওষুধ ভুল লেবেল মেরে বিদেশে সরবরাহ করা হয়। আবার লোক মরল কয়েকজন। কোম্পানির বদনাম হল। জানা গেল না, ভুল লেবেল, কীভাবে এল।

চার নম্বর রিপোর্ট–কঠিন প্রহরার ব্যবস্থা। তার মধ্যে থেকেও ল্যাবরেটরি থেকে মারাত্মক টক্সিন বাইরে চালান হয়ে গেল। খবরের কাগজে খবরটা ছাপা হলে সবাই আতঙ্কিত হল।

এবার স্যাম রফের লেখা নোট–পাবলিকের কাছে কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করার জন্য আমার ওপর বারবার চাপ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি রাজি না হওয়ায় এই ধরনের জঘন্য চক্রান্ত করা হয়েছে। আমি ওই বেজন্মাটাকে ঠিক ধরব।

ঠিক এই ব্যাপারটা লিজের ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছিল। ওরা সবাই লিজাকে চাপ দিচ্ছিল, কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করার প্রস্তাবে সে যেন সই করে।

ফোন বেজে উঠল–

–হ্যালো লিজা? আমি রিস্ বলছি।

–রিস, মঙ্গলবার দুপুর দুটোয় বোর্ড মিটিং কল করো।

লিজা রিসিভার নামিয়ে রাখল। সে মনকে শক্ত করল।

লিজা ঘুমিয়ে পড়ল, স্বপ্ন দেখল। দড়ি বেয়ে তার বাবা পাহাড়ে উঠছে আর তাকে বলছে নীচে অতল গহ্বর, গভীর শূন্যতা। নীচে তাকিও না। হঠাৎ বাজের আগুনে স্যামের দড়ি পুড়ে গেল। স্যাম অতল গহ্বরে হারিয়ে গেল। এলিজাবেথ আর্তনাদ করে উঠল। বাইরে বজ্রবিদ্যুতের শব্দে তা চাপা পড়ে গেল।

লিজা বিছানায় উঠে বসল। ঘামে সপসপ করছে সারা শরীর। বাইরে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি। সে তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করে দিল।

বিশ্রী আবহাওয়া। অ্যালেকের আসতে দেরি হতে পারে। গোপন জায়গায় রিপোর্টগুলো সরিয়ে রাখা দরকার। সে লাইব্রেরিতে ঢুকল। কিন্তু কোথায় রিপোর্ট।

.

০৫.

খোলা জানালা। ঝড়বৃষ্টির জন্যে কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। রিপোর্টর কয়েকটা কাগজ ভিজে কার্পেটের ওপর পড়ে, বাকিটা নেই। ঝড়ে উড়ে গেছে হয়তো। বাইরে? না, লনেও তো নেই। তাহলে কি পাহাড়ের উপর উঠে পড়েছে?

ওগুলোর কোনো নকল নেই।

স্যাম গোয়েন্দাকে কাজে লাগিয়েছিল। কিন্তু কে সে? মিস আরলিং সম্ভবত জানে না।

ঘরে খাবার নেই। অ্যালেক আসার সময় হল। তার আগে কালা ডি ভোলপে বাজার সারা দরকার।

চুলে স্কার্ফ বেঁধে নিল লিজা। রেনকোট পড়ল। পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। গ্যারেজে ঢুকে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

সরু ফাঁকা পাহাড়ি রাস্তা, নীচে সমুদ্র। ঝড়ে উত্তাল। লিজা খুব ধীরে গাড়ি চালাচ্ছিল। একটু এদিক-ওদিক হলেই খাদে বা সমুদ্রের তলায় গিয়ে ঠেকতে হবে।

উৎরাইয়ের মুখে বিপজ্জনক বাঁক। ফুটব্রেকে পা রাখল সে, গতি কমানোর চেষ্টা করল। কিন্তু কিছু লাভ হল না।

লিজ বরাবর চাপ দিল ফুটব্রেকে। কিন্তু স্পিড না কমে বেড়ে গেল। গাড়ি তখন বাঁক পেরিয়ে দুর্দান্ত গতিতে ছুটছে পাহাড়ি রাস্তার উত্রাই ধরে।

লিজা আবারও ব্রেকে চাপ দিল। কোনো লাভ হল না। নিশ্চয়ই ব্রেক খারাপ হয়ে গেছে।

আবার একটা বাঁক। স্পিডোমিটারের কাঁটা তখন দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। লিজের হৃৎপিণ্ড কঁপছে। মুখেচোখে আতঙ্কের হিম শীতলতা। খাদের ধার দিয়ে স্কিট করল

জীপ। আবার রাস্তা ধরে ছুটে চলল। ঢালু উত্রাই। কোনো ক্যারিয়ার বা কনট্রোল নেই। একটির পর একটি বিপজ্জনক বাঁক। গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়লে কেমন হয়? না, তা সম্ভব নয়। ঘন্টায় সত্তর মাইল গতি, একপাশে পাথরের দেয়াল, অন্যদিকে খাদ। মৃত্যু অনিবার্য।

মৃত্যু? না, মার্ডার?

হ্যাঁ, মার্ডার। স্যাম রফকে খুন করা হয়েছে। সে শেয়ারগুলো পরিবারের বাইরে বিক্রি করতে রাজি হয়নি। তাই নানাভাবে কোম্পানির ক্ষতি করে তার ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। স্যাম বুঝতে পেরেছিল, অপরাধী কে? তাই সে গোয়েন্দা লাগিয়েছিল।

কিন্তু, কিন্তু শেষপর্যন্ত স্যাম রফকে মরতে হল। তাকে খুন করা হল।

এখন লিজার পালা। শেয়ার বিক্রির ব্যাপারে সে বিশেষ উৎসাহ দেখায়নি। দোনামোনা করেছে। তাই তাকে খুন করার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। কিন্তু খুনী কে? অপরাধী কে? অ্যালেক? না ইভো? ওয়ালথার, না শার্ল? কে?

রিপোর্টে লেখা আছে–কোম্পানির উঁচু তলার কোনো লোক।

সবাই জানে, স্যাম রফ অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। একদিকে পাহাড়, অন্যপাশে খাদ। জীপ স্কিট করেছে। নীচের দিকে ছুটছে। স্পিডোমিটারে দেখা গেল, গাড়ির গতি তখন ঘন্টায় আশি মাইল। সামনে অসম্ভব সরু বাঁক।

বাবা বলছে লিজ, একা অন্ধকারে কী করছ?

লিজ স্টেজে নেচেই চলেছে। নাচের টিচার চেঁচিয়ে চলেছে। নাকি হাওয়ার গর্জন?

এবং রিস্ উইলিয়ামস বলছে–একুশতম জন্মদিন মেয়েদের জীবনে বারবার আসে না।

একি আনন্দিত দুঃস্বপ্ন।

সরু বাঁক, দ্রুত গতিতে ছুটছে গাড়ি। এগিয়ে আসছে পাহাড়।

ঠিক তখনই, লিজা লক্ষ করল, ওপর দিকে সংকীর্ণ একটা পাহাড়ি রাস্তা উঠে গেছে। অর্থাৎ গাড়ির স্পিড কমানো যেতে পারে। এটাই সুযোগ। সে জীপ ঘোরাল। দুপাশে গাছের সারি। ডালপালা, পাতা ঝাপটা মারছে জীপে।

সামনে–

নীচে অতল সমুদ্র।

হঠাৎ গাড়ি স্কিট করল। একটা গাছের সঙ্গে। একটা বিস্ফোরণ। সব কিছু চুরমার হয়ে গেল।

তারপর?

তারপর সবকিছু শান্ত নীরব হয়ে গেল।

.

০৬.

লিজা চোখ খুলল। হাসপাতালের বিছানায় সে। সামনে দাঁড়িয়ে স্যার অ্যালেক নিকলস।

অ্যালেক, লিজা কেঁদে ফেলল, ঘরে খাবার নেই।

অ্যালেকের চোখ ছলছল–লিজা শান্ত হও। দুদিন ধরে তোমার জ্ঞান নেই। বাঁচার কোনো আশা ছিল না। মাথায় চোট, কাটা ছেঁড়া, কিন্তু যিশু সহায়! বড়ো কিছু হয়নি। ওই সরু রাস্তায় গিয়েছিলে কেন?

–অ্যালেক, এটা কোনো দুর্ঘটনা নয়। কেউ আমাকে খুন করতে চেয়েছিল। গাড়ির ব্রেক খারাপ করে রেখেছিল।

কী জন্য?

তা আমি বলতে পারব না। ওলবিয়ার পুলিশ স্টেশনে অ্যালেক ফোনে কথা বলল। পুলিশ প্রধান তার দলবল নিয়ে হাজির হল। সে অ্যালেকের বয়েসী হবে। মস্ত বড়া হুঁড়ি। সে চিফ অফ পুলিশ লুইজি ফেরারো। গোয়েন্দা ব্রুনো ক্যামপানার বয়স প্রায় পঞ্চাশ। পেশিবহুল চেহারা। কর্মঠ, দেখলেই বোঝা যায়।

লিজা পুলিশ গ্যারাজে গেল। যদিও ডাক্তারের নিষেধ ছিল। অ্যালেকও বারণ করল। তখন হাইড্রলিক হ্যাঁসেটে তুলে জীপ পরীক্ষা করছিল মেকানিক। বাঁদিকের ফেনডার ও রেডিয়েটর ভাঙা, গাছের পাতার রস লেগে আছে গাড়ির গায়ে।

মেকানিক বলল–দারুণ মজবুত। আজকালকার গাড়ি হলে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেত।

–ব্রেক?

–ঠিক আছে।

–অসম্ভব ব্রেক ধরছিল না।

মিস রফ ভাবছেন, চিফ লুইজি বলে, ওটা কেউ বিকল করে রেখেছিল।

না, স্যার। জীপের ব্রেক খারাপ করার দুটো উপায়। ব্রেক লিংক কাটা। তার মানে নাট আলগা করে ব্রেক ফ্লুইড লিক করার ব্যবস্থা। অথচ, লিংক কিছু হয়নি, ব্রেক ড্রাম ভর্তি।

–এমনও তো হতে পারে, অ্যালেক বাধা দিয়ে বলল, কেউ শূন্য ব্রেক-ড্রামে ব্রেক ফ্লুইড ভরে দিয়েছে।

তা সম্ভব নয় স্যার। এই নাট খুললে রেনচের দাগ দেখা যেত। দেখুন

হাইড্রলিক লিফটে গাড়িটা নামিয়ে আনা হল। মেকানিক গাড়ি চালু করল।

জীপ সে দাঁড় করাল গোয়েন্দা ব্রুনো ক্যামপানার সামনে।

ক্যামপানা বলল–যদি কেউ ব্রেকের লাইনিং ভিজিয়ে দেয়, ওটা যখন ড্রামে চাপ দেবে, কোনো ট্রাকশন না থাকায় তখনও তো জীপ থামবে না।

–আপনি ঠিক বলেছেন। মেকানিক বলল, কিন্তু মিস যখন গাড়ি স্টার্ট করেছিল, তখন কি ব্রেক কাজ করেছিল?

-হ্যাঁ।

–তাহলে ব্রেক লাইনিং পরে জলে ভিজে গিয়েছে।

পাহাড়ি পথে বৃষ্টিতে এরকম হয়ে থাকে। চিফ লুইজি ফেরারো বলল।

.

বাড়িতে ফিরে এল ওরা। অ্যালেক খাবার তৈরি করল। কোনোটার নুন বেশি, কোনোটা পুড়ে গেছে। লিজা তাই খেল। মুখে কিছু বলল না। সে অ্যালেককে দুঃখ দিতে চায় না।

ফোন এল ইভো ও সিমনেত্তা। হেলেন ও শার্ল। ওয়ালথার। লন্ডন থেকে ভিভিয়ান। রিসের ফোনও পায়।

–তুমি কি গাড়ি চালানোয় হেলেনকে টেক্কা দিতে চাইছিলে?

-না, আমি চ্যাম্পিয়ান হতে চাই না। আমি কেবল পাহাড়ি উত্রাইয়ের পথে স্পিডে গাড়ি চালাই।

মনে মনে লিজা ভাবে, না-না, মিসেস রিস্ উইলিয়ামস।

–তোমায় খুব পুলকিত লাগছে। অ্যালেক জানতে চাইল।

–আমাদের জুরিখে যেতে হবে। বোর্ড মিটিংটা খুব জরুরি।

.

কনফারেন্স রুম। সিগারেটের ও চুরুটের ধোঁয়া। বাতাস ভারী।

লিজা মাথায় যন্ত্রণা বোধ করল–আমি ঠিক করেছি, শেয়ার পাবলিকের হাতে তুলে দেওয়া চলবে না।

–আমাদের কোম্পানির জন্য একজন পাকা প্রেসিডেন্ট প্রয়োজন। অ্যালেক বোঝাল, এব্যাপারে তোমার না থাকাই ভালো। এটা তোমার পক্ষেই মঙ্গল।

ইভো বলল–ডার্লিং, তুমি সুন্দরী, যুবতী। জীবন উপভোগ করো। ব্যবসা...

–একথা ঠিক, একটা দুঃখজনক দুর্ঘটনার জন্য বেশির ভাগ শেয়ার তুমি পেয়েছ, শার্লের বক্তব্য। কিন্তু ব্যাপারটা ত সহজ নয়, কোম্পানি চালাবার চেষ্টা করলে ঝামেলা বাড়বে।

–শেয়ার বেচার এটাই উপযুক্ত সময়। ওয়ালথারের স্পষ্ট কথা, এর পরে কিছু করা যাবে না।

লিজা ভাবল, এদেরই মধ্যে কেউ একজন কোম্পানির ক্ষতি করতে চাইছে। শেয়ার বেচে দিলে, তাকে আর ধরা যাবে না।

অবশেষে রিস্ বলল–মিস রফ যা বলছে সকলের তা মেনে নেওয়া উচিত।

-ধন্যবাদ রিস্। আমার বাবা নেই। আমিই এখন কোম্পানির প্রেসিডেন্ট। সেটা ঘোষণা করে দাও।

কেউ আর এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করল না।

.

কিন্তু

কিন্তু তখন একজন মনে মনে ভাবছে–প্রেসিডেন্টের মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। কত প্রেসিডেন্ট মরল।

.

০৭.

–মিস আরলিং, একটা কনফিডেনসিয়াল রিপোর্ট আমি হাতে পেয়েছি। বাবার তৈরি, এ ব্যাপারে আপনি কিছু বলতে পারেন?

-না, মিস রফ। আমি কিছু জানি না।

–কে বলতে পারে বলে মনে হয়?

–কোম্পানির সিকিউরিটি ভিভিয়ান।

হতে পারে না, লিজা মনে মনে বলল। একটু হেসে ধন্যবাদ জানিয়ে সে চলে গেল।

.

উইলটন ক্রশ। অর্থকরী ব্যাপারে খুব অভিজ্ঞ।

ব্যাঙ্কের ছশো পঞ্চাশ মিলিয়ন ধার শোধ করা হয়নি কেন? লিজা জানতে চাইল।

–মামলা, ক্ষতিপূরণ, ব্যর্থ রিসার্চ প্রোজেক্ট।

–আমাদের প্রতিষ্ঠানকে কেন ব্যাঙ্ক টাকা শোধের জন্য চাপ দেবে?

–ওরা ওষুধের পাশাপাশি কোম্পানির সুনামের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়। আমাদের সমস্যাগুলো কারো আর অজানা নেই। কোম্পানির বদনাম হয়েছে। আমাদের ব্যাঙ্কার

আমাদের প্রতিযোগীদেরও ঋণ দিয়েছে। তাই ওরা চাপ দিচ্ছে। ব্যাঙ্কিং কনসার্টিয়ামের নেতা হের জুলিয়স বাদরাট অনেকবার ফোন করেছেন।

–আমি বর্তমান প্রেসিডেন্ট উনি কি তা জানেন?

–তাহলে উনি আর ধার শোধের সময়টুকুও দেবেন না।

–কফি খাবেন?

ধন্যবাদ।

–এ সম্পর্কে আপনার উপদেশ কী?

সোজা ব্যাপার। কোম্পানির শেয়ার বাইরে বিক্রি করে দিন। ঋণ শোধের টাকা উঠে আসবে।

লিজা মনে মনে বলল, ইনিও শত্রুদের একজন।

.

০৮.

হামবুর্গ। শুক্রবার, ১লা অক্টোবর। রাত দুটো।

ঠান্ডা, ভিজে হাওয়া। সমুদ্রের দিক থেকে আসছে। হামবুর্গের রীপারবন অঞ্চল। পাপ নগরী, নিষিদ্ধ এলাকা। গলিখুঁজিতে উৎসুক মানুষের আনাগোনা। এখানে নেশার অঢেল আমদানি-কোকেন, মদ, মরফিয়া, হেরোইন, মেয়েমানুষ, ছোটো ছেলে–সব। শুধু চাই পয়সা। বড়ো রাস্তার ওপর বড়ো বার। উজ্জ্বল আলোয় চোখ ঝলসে যায়। পাশেই একশ্যারানগ্ন ও অশ্লীল স্ট্রিপ শোর ব্যবস্থা। নারী মাংস পাওয়া যায়, কসাইখানার মতো। সব পাবে, শুধু দাম চাই। স্বাভাবিক লোকদের জন্য আছে সাধারণ সেক্স। মুখ-মৈথুন পছন্দ করে অস্বাভাবিক সেক্সিরা। চাইলে বারো বছরের ছেলে বা মেয়েকে বিছানায় নিয়ে লুটেপুটে ভোগ করতে পারো। মৈথুন দৃশ্য দেখবে-মস্ত বড়ো কুকুরের সঙ্গে মাদী মানুষের? পাবে। মর্ষকামী হলে ওরা চাবুকের ঘায়ে তোমার কামোন্মাদনা জাগিয়ে দেবে। আয়না লাগানো বেডরুম। যৌন উত্তেজনা জাগছে না? মেয়েমানুষ নাও। একজন-দুজন-তিনজনযত খুশি। খাটো ঝুলের স্কার্ট আর আঁটসাট খাটো ব্লাউজ পরে বেশ্যারা ঘুরে বেড়ায়। পেভমেন্টে ছেলেদের, মেয়েদের বা দম্পতিদের নানা বিশ্রী প্রস্তাব দেয়।

পর্নোফিল্মের ক্যামেরাম্যান এই রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটছে। এক যুবতী, বয়স আঠারো, সোনালি চুল। বান্ধবীর সঙ্গে গল্প করছিল। ক্যামেরাম্যান তার সামনে দাঁড়াল।

মেয়েটা ফিক করে হাসল–তুমিও আমার বন্ধু। এসো, তুমি আমার কাছ থেকে অনেক আনন্দ পাবে।

-তোমার নাম?

–হিলডা।

–তুমি ফিল্মে অভিনয় করতে চাও?

–ওসব ফালুত ফকিবাজি কারবার ছাড়ো।

পর্নোফিল্মে।

করব। অ্যাডভান্স চাই। পাঁচশো মার্ক।

ক্যামেরাম্যান তার হাতে টাকা তুলে দিল।

হিলডা ভাবল, আরও বেশি চাইলেও পাওয়া যেত। যাকগে পরে বোনাস হিসেবে চেয়ে নেবে। কী করতে হবে জিজ্ঞেস করল–

.

হিলডা নার্ভাস।

ছোট্ট ঘর। কম দামের আসবাব।

হিলডা বিছানায়, উলঙ্গ। তাকিয়ে আছে উপস্থিত তিনটে লোকের দিকে। ভাবছে আর দেখছে। কেমন গোলমেলে ঠেকল তার। বার্লিন, মিউনিখ, হামবুর্গের রাস্তায় বেশ্যাবৃত্তি করে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা বেড়েছে তার। সে বুঝল, এখানে অস্বাভাবিক কিছু ব্যাপার আছে। সে কি পালিয়ে যাবে? না, তা হবার নয়। পাঁচশো মার্ক অগ্রিম নিয়েছে, শুটিং শেষ হলে

আরও পাঁচশো মার্ক পাবে। বেশ্যাগিরি করাই তার পেশা। ব্লু ফিল্মে সে ভালো কাজই করতে পারবে।

তার পাশে শুয়ে আছে পেশীবহুল চেহারার এক পুরুষ। নগ্ন, লোমহীন শরীর। মুখটা দেখে প্রথম ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে। এই ধরনের ফিল্মের হিরো হওয়ার পক্ষে লোকটা ঠিক নয়।

ছায়ার আড়ালে যে লোকটা দর্শক হয়ে বসে আছে তাকে আরও বেশি অদ্ভুত ঠেকল। তার। চোখে গগলস, মাথায় মস্ত বড়ো টুপি। পুরুষ না মেয়েমানুষ, বোঝা যাচ্ছে না।

হিলডার গলায় রিবন বেঁধে দেওয়া হল।

–কেন? এটার কি দরকার?

–তোমরা অ্যাকশন শুরু করো। ক্যামেরাম্যান বলল।

ক্যামেরা সক্রিয় হল।

বিছানায় পুরুষ চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। হিলডা লোকটার কান, ঘাড়, বুক ছুঁয়ে ঠোঁট ও জিভের ছোঁয়া দিল পেটে, তলপেটে, পায়ে, পায়ের আঙুলে।

পুরুষের পুরুষাঙ্গটি খাড়া হয়ে উঠেছে। হিলডার জিভ ও ঠোঁট উঠে গেল পায়ের আঙুল থেকে পুরুষটির বিশেষ অঙ্গের দিকে। লোকটার দণ্ডটি প্রচণ্ড শক্ত ও লম্বা হয়ে উঠেছে।

নাও, স্টার্ট।

দণ্ডটা হিলডার ত্রিকোণে ঢুকছে বেরোচ্ছে। হিলডার নিতম্ব তালে তালে আন্দোলিত হচ্ছে। হিলডার আর ভয় করছে না। বরং পুলক জেগেছে মনে। চোখ বন্ধ করে আরাম উপভোগ করছে।

দর্শক ঝুঁকে পড়ে এই দৃশ্য দেখছে। হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠল–ওর চোখ।

–চোখ খোলল। ক্যামেরাম্যানের নির্দেশে হিলডা চোখ মেলল।

আরো জোরে জোরে লোকটা চাপ দিচ্ছে। হিলডা সাধারণত মেয়েদের সঙ্গে ফুর্তি করে চরম মুহূর্তে পৌঁছোয়। পুরুষ মানুষটির সঙ্গে শুয়ে সে সেই চরম পর্যায়ে পৌঁছাতে পারল না। কিন্তু অভিনয় করে শিৎকারের শব্দ করল সে। কারণ ক্যামেরাম্যান আগেই তাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিল, চরম পুলক লাভ না করলে বোনাসের টাকা পাবে না। অথচ ওই টাকা দিয়ে সে কী কী করবে, ভেবে রেখেছে।

এবার সত্যি সত্যি চরম পুলক উপস্থিত। হিলডা চিৎকার করে উঠল।

দর্শক খুশি।

ক্যামেরাম্যান হিরোকে বলল–এবার।

হিলডার গলার দিকে হিয়োর বলিষ্ঠ হাত দুটো উঠে এল। হিলডার শ্বাসনালীতে তার আঙুলের চাপ। লোকটার চোখে জিঘাংসার দৃষ্টি। মেয়েটি ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠতে

গিয়েও পারল না। তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। শরীর ঝাপটা দিতে থাকল। তারপর কয়েক মুহূর্ত পরেই শরীরটা কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল।

.

০৯.

জুরিখ। সোমবার। ৪ঠা অক্টোবর। বেলা ১০টা।

বৈজ্ঞানিক এমিল জেপলি গোপন রিপোর্ট পাঠিয়েছে। রিপোর্টের গুরুত্ব বুঝে এলিজাবেথ নিজেই তার সঙ্গে দেখা করতে গেল।

বছর পঁয়ত্রিশের জেপলি রোগা ও লম্বা। মাথায় টাকের পাশে কিছুটা লাল চুল।

লিজকে দেখে সে হকচকিয়ে গেল।

রিসার্চের ব্যাপারে লিজা তার কাছে জানতে চাইল।

সঙ্গে সঙ্গে হতভম্ব ভাব কাটিয়ে সে বলল–কোলাজেন হল শরীরের যে-কোনো কানেকটিভ টিসুর মূল প্রোটিন উপাদান। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রোটিনের যে পরিবর্তন আসে, আমি সেটা বন্ধ করার উপায় বের করতে চাইছি। এক্ষেত্রে মিউকোপলিস্যাকারাইড ও এনজাইমের ক্রিয়া বন্ধ করার প্রক্রিয়া ব্যবহার করব।

তার মানে বৈজ্ঞানিক জেপলি বার্ধক্যকে ঠেকিয়ে রাখার ওষুধ বের করার কাজ করছে। জেপলির ধারণা–এই ওষুধ খেয়ে মানুষ একশো-দেড়শো বছর পরমায়ু লাভ করবে। ক্যাপসুল খেলেই হবে, ইনজেকশনের প্রয়োজন নেই।

লিজা বুঝল, ওই ওষুধের সম্ভবনা কী বিরাট! এমনকি পঞ্চাশের ওপরে যাদের বয়স, তারাও এই ক্যাপসুল খাবে। তার মানে তাদের ব্যবসা কোটি কোটি ডলার বেড়ে যাবে।

গত চার বছর ধরে আমি এই পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছি। পশুপাখির ওপর প্রয়োগ করে ভালো ফল পেয়েছি। এবার মানুষের ক্লিপিক্যাল ট্রায়াল শুরু করলেই হয়।

আপনার এই গবেষণার কথা কে কে জানে?

–জানতেন আপনার বাবা স্যাম রফ। এটা রেড ফোল্ডার প্রোজেক্ট। তাই নিয়মানুযায়ী একজন বোর্ডসদস্যকেও রিপোর্ট পেশ করতে হয়।

–সে কে?

–ওয়ালথার গ্যাসনার।

-শুনুন, গ্যাসনারকে আর রিপোর্ট পাঠানোর দরকার নেই। যা কিছু রিপোর্ট একমাত্র আমাকেই দেবেন। কত দিন অপেক্ষা করতে হবে?

এক থেকে দেড় বছর।

টাকা, লোক, যন্ত্রপাতির জন্য চিন্তা করবেন না। যা দরকার হবে, আমাকে বলবেন। যত তাড়াতাড়ি পারেন কাজটা শেষ করুন।

-বেশ। আপনার বাবা স্যাম রফকে আমি খুব পছন্দ করতাম।

ধন্যবাদ।

যুগান্তকারী একটি ওষুধ রফ অ্যান্ড সন্সের ল্যাবোরেটরিতে আবিষ্কার করতে চলেছে এমিল জেপলি নামের এক প্রতিভাধর বৈজ্ঞানিক-খবরটা স্যাম রফ জানত। সম্ভবত সেই কারণে সে কোম্পানির শেয়ার বিক্রির ব্যাপারে বিরোধিতা করেছিল।

.

মিস আরলিং, রেড, ফোল্ডার প্রোজেক্টের নিয়মগুলো আমায় বলবেন?

–পঞ্চাশ হাজার ডলার পর্যন্ত খরচে বিভাগীয় প্রধান অনুমতি দিতে পারেন। তার ওপরে হলে বোর্ডের অনুমতি নিতে হয়। যে রিসার্চ প্রোজেক্ট প্রাথমিক পরীক্ষায় সফলতা লাভ করে তাকেই রেড ফোল্ডার প্রোজেক্ট বলা হয়। তখন নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা আছে, এমন বিশেষ ঘরে কাজ হয়। কেবল তিন জনের কাছে রিপোর্ট থাকে। বিজ্ঞানী ইনচার্জ, প্রেসিডেন্ট এবং বোর্ডের একজন ডাইরেক্টর।

-কোন্ সদস্যের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল?

–সেটা আপনার বাবাই ঠিক করেছিলেন। ওয়ালথার গ্যাসনার।

কথাটা বলেই মিস আরলিং চুপ করে গেল। সম্ভবত নিজের ভুল বুঝতে পারল। মিস রফ এখনও বৈজ্ঞানিকের নামই বলেনি।

মিস আরলিং এই অত্যন্ত গোপন খবরটা জানল কী করে? স্যাম বলেছে? না কি অন্য কোনো উপায়ে?

এখন ওয়ালথার গ্যাসনারের সঙ্গে কথা বলা দরকার। ফোনে? না, বার্লিনে যাওয়াই ভালো।

.

এক রেস্তোরাঁয় ডিনারে বসেছে ওরা। ওয়ালথার গ্যাসনারকে নার্ভাস দেখাচ্ছে। তার মুখে অদ্ভুত সব দুশ্চিন্তার ছাপ, যা তাকে অসুন্দর করে তুলেছে।

–অ্যানা কোথায়?

ও বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছে।

–ফোনে ডাকব?

–না, ওকে এখন বিরক্ত করা ঠিক হবে না।

লিজা এবার এমিল জেপলির কথা পাড়ল।

–ওর কাজটা সফল হলে

বিরাট কাজ।

–ও তোমাকে আর রিপোর্ট দেবে না।

কারণ?

–ব্যক্তিগত কিছু নয়। অন্য কোনো বোর্ড মেম্বার হলেও আমি একাই ব্যাপারটা দেখতাম।

জানি, সে ক্ষমতা তোমার আছে। লিজা, অ্যানার অনেক শেয়ার আছে রফ অ্যান্ড সন্স-এ। যদি শেয়ার পারলিককে বিক্রি করার ব্যাপারে তুমি রাজি থাকো–

দুঃখিত। এখন ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই।

লিজা লক্ষ্য করল, কথা বলতে বলতে প্রচণ্ড উত্তেজনায় ওয়ালথারের হাত কাঁপছিল।

.

১০.

জুলিয়াস বাদরাট। ব্যাঙ্কার, রোগা, ভঙ্গুর ধরনের চেহারা। কাঠির মতো দুটি হাত। শুকনো পাতলা অসমাপ্ত মুখ। ওর সঙ্গে আরও পাঁচজন ব্যাঙ্কার এসেছে। তাদের পরনে কালো স্যুট, ওয়েস্টকোট, সাদা শার্ট ও কালো টাই।

কফি, প্যাস্ট্রি, লাঞ্চ-সবাই ওরা সবিনয়ে প্রত্যাখান করল। ওরা ঋণের টাকা ফেরতের ব্যাপারে এসেছে।

–আপনাদের কী দোষ বলুন? আমি এক অনভিজ্ঞ প্রেসিডেন্ট। ঋণ শোধের মেয়াদ বাড়ানোর আর্জি জানালে আপনারা শুনবেন কেন? আমার বাবা ছিলেন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী। তবুও তিনি যখন প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তখন থেকে তার ওপর আপনারা চাপ সৃষ্টি করে চলেছেন।.....

আপনাদের ব্যাঙ্কের নামডাক আছে পৃথিবীব্যাপী। আমি শুধু একটা কথাই বলতে চাই, বড়ো হতে হলে দূরদৃষ্টির প্রয়োজন। শুধু ডলার-সেন্টের হিসাব কষলেই হয় না। আপনারা নিশ্চয়ই ব্যতিক্রমী নন। রফ অ্যান্ড সন্সের অবদান, মানুষের জীবন বাঁচাতে, মানুষের জীবিকার সুযোগ করে দিয়ে–

জুলিয়াস হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল–আপনাদের কোম্পানির শেয়ারগুলো বাইরে বিক্রি করে দিন। ধার শোধ হয়ে যাবে।

ধার শোধ হওয়াটাই কি মুখ্য ব্যাপার? টাকাটা কোথা থেকে এল...

–তা ব্যাঙ্কের ভাবনা নয়।

–রফ অ্যান্ড সন্স আপনাদের কাছে তিনমাস সময় চাইছে। বিশ্ববিখ্যাত ওষুধ কোম্পানি। টাকাটা মার যাবে না।

...তাছাড়া, এটা অত্যন্ত সিক্রেট ব্যাপার, আশা করি, এটা আপনারা বাইরে ফাঁস করবেন না–খুব শীগগিরই একটা নতুন ওষুধ আমরা বাজারে ছাড়ছি। বলতে পারেন যুগান্তকারী অবদান।

জুলিয়াস বলল–এটা কীসের ওষুধ?

-সরি। আর বলা উচিত হবে না। তবে প্রোডাকসন বাড়াতে হবে, প্রায় তিনগুণ, ব্যাঙ্কের আরও লোন লাগবে।

ব্যাঙ্কাররা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

আপনাকে আগের ঋণ শোধ করার জন্য তিন মাস সময় দিলাম। জুলিয়াস বলতে থাকল, তবে সুদ বেশি লাগবে। আর আপনারা শুধু আমাদের কাছ থেকেই ঋণ নের্বেন, এই শর্তে।

–নিশ্চয়ই!

.

কাজের চাপে এলিজাবেথ রফ একেবারে নাজেহাল। হেড কোয়ার্টারের নানা বিভাগ, বাইরের ফ্যাক্টরি থেকে, গ্রীনল্যান্ডের ল্যাবরেটরি থেকে, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ডের অফিস থেকে, পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে খবর আসছে নতুন ওষুধ। বিক্রির হিসাব, স্ট্যাটিসটিক্স, বিজ্ঞাপন ও রিসার্চের পরিকল্পনা। নতুন বাড়ি কেনা, পুরোনো বাড়ি বিক্রি, অন্য কোম্পানি কিনে নেওয়া, পুরোনো অফিসারদের সরিয়ে দিয়ে নতুনদের বহাল করা। অবশ্য এইসব কাজের ব্যাপারে এক্সপার্টদের উপদেশ পাওয়া যায়। কিন্তু সর্বশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হল প্রেসিডেন্ট, তার মানে এলিজাবেথ রফ।

সারা বছর ধরে তাকে পৃথিবীর নানা দেশে ঘুরতে হয়। রফ অ্যান্ড সন্সের বিভিন্ন শাখা-গুলিতে তাকে যেতে হয়।

একটা ব্যাপারে এলিজাবেথ অসুবিধা অনুভব করে। এটা পুরুষশাসিত সমাজ। মেয়েদের অর্থাৎ সুন্দরী যুবতীর কাছ থেকে তারা অর্ডার নিতে অভ্যস্ত নয়। অনেকে ভাবে, লিজাকে শয্যাসঙ্গিনী করতে পারলেই বুঝি সব কাজ সহজ হয়ে যাবে।

ওদের ধারণা ঠিক নয়। আসলে লিজার বুদ্ধি আছে, মন ও মনন আছে। তাই সে কর্তৃত্ব করতে পারছে।

এবং ব্লাডলাইন

এলিজাবেথের ধমনীতে রফ অ্যান্ড সন্সের প্রতিষ্ঠাতা স্যামুয়েল রফের শোণিত বইছে। সে অসাধারণ গুণসম্পন্ন–দুর্দম ইচ্ছশক্তি, মনের প্রচণ্ড জোর এবং কর্তৃত্ব করার স্বাভাবিক ক্ষমতা। সে পুরুষের কথা শোনে, প্রশ্ন করে, খবর জেনে নেয় এবং কাজ শিখে নেয়।

জুরিখে বোর্ড অফ ডাইরেক্টরদের মিটিং বসে সপ্তাহে একবার। লিজাকে সেখানে যেতে হয়। বোর্ডের ডাইরেক্টররা সবাই তার আত্মীয়, দূরসম্পর্কের ভাই বা ভগ্নীপতি।

এদের মধ্যেই একজন নিজের শাখা কোম্পানিতে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। তার দোষেই অসহায় মানুষগুলি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।

সে-ই নিজের কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ ওষুধের ফর্মুলা সাপ্লাই করেছে অন্য কোম্পানিতে। রফ অ্যান্ড সন্সের বদনাম হয়েছে।

কিন্তু সে কে?

ইভো পালাজজি? সেই হাসিখুশি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের মানুষটি?

অ্যালেক নিকলস? অত্যন্ত ভালোমানুষ। ভদ্রলোক। প্রয়োজনে এলিজাবেথকে সাহায্য করার জন্য ছুটে এসেছে।

শার্ল মারতেইল? যে স্ত্রীর ভয়ে জুজু হয়ে থাকে? অবশ্য ভয়ে মানুষ অনেক সময় বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

এবং ওয়ালথার গ্যাসনার? জার্মান প্লেবয়। সুদর্শন, মিষ্টি ব্যবহার, কিন্তু ওর ভেতরটা? অ্যানা ওর বউ, তেরো বছরের বড়ো। সে সুদর্শন ও সুপুরুষ। গ্যাসনার কি শুধু টাকার লোভে অ্যানাকে বিয়ে করেছে?

এলিজাবেথ ওদের সঙ্গে বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছিল আর তাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিল।

না, ঘাতক অত্যন্ত বুদ্ধি ধরে। সে সহজে ধরা দেবে না।

ক্রমশ ওষুধের ব্যবসার ভেতরের ব্যাপারগুলো বুঝে নিল লিজা। কোম্পানিতে কোম্পানিতে প্রতিযোগিতা চলছে। কে কাকে টেক্কা দেবে! কোনো কোম্পানির ওষুধ খেয়ে রোগী মরলেই প্রায় একডজন ওষুধ কোম্পানি সেই খবর পুরো পৃথিবীতে চাউর করে দেয়। কিন্তু ওপর থেকে বোঝার উপায় নেই, যেন কত ভাব।

বিভিন্ন পার্টিতে ছোটো-বড়ো ফার্মের মাথারা আসে। নিজের সমস্যা নিয়ে কথাবার্তা বলে।

এমনই এক পার্টিতে দেখা গেল একা এলিজাবেথ বাদে আর সবাই পুরুষ!

মস্ত বড়ো এক কোম্পানির মাঝবয়সী ও অহংকারী প্রেসিডেন্ট বলল, বর্তমানে নতুন ওষুধ বের করার ব্যাপারে সরকার কত নিয়মকানুন বের করেছে। যদি অ্যাসপিরিন এখন আবিষ্কৃত হত, তাহলে তাও বাজারে সহজে চালু করা যেত না। লিটল লেডি, অ্যাসপিরিন কতদিন আগে চালু হয়েছে বলতে পারো?

লিটল লেডি, মানে এলিজাবেথ রফ।

–খ্রিস্টের জন্মের চারশো বছর আগে, সেই সময় হিপোক্রিটিস উইলো গাছের ছালে প্রথম স্যালিসিন খুঁজে পেয়েছিলেন।

-ঠিক বলেছ! বিদ্রূপাত্মক হাসিটা তার ঠোঁটে আর দেখা গেল না।

সপ্তাহে একবার প্লেনে পাড়ি দিতে হয় মিস রফকে। বোম্বাইয়ের মতো বড়ো শহরে, পুয়েরতো ভালোরর মতো সুন্দর এলাকায় ফ্যাক্টরি ম্যানেজারের সঙ্গে সে দেখা করে। এখন লিজের কাছে গুয়াতেমালা মানেই ম্যানেজার এমিল নুনোজ। তার বউটি খুব হাসি খুশি ও মোটা। একডজন ছেলেমেয়ে। কোপেনহাগেনে গেলে ম্যানেজার নিলস জর্ণ-এর সঙ্গে কথা বলে। নিলস তার পাঁচ মায়ের সঙ্গে থাকে এবং রিওডি জানেরো মানে আলেজান্দ্রো দুভাল ও তার সুন্দরী রক্ষিতা।

এমিল জেপলির ফোন আসে।

–একটা ছোট্ট সমস্যা দেখা দিয়েছিল মিস রফ, এখন মিটে গেছে। তবে একটু দেরি হয়ে গেল।

–কিছু দরকার হলেই জানাবেন।

ব্যাঙ্কের ধার শোধ করার জন্য তিনমাস সময় পাওয়া গেছে। এর মধ্যে প্রোজেক্টের কাজ শেষ হবে বলে মনে হয় না লিজার। সে ঠিক করল, গোপনে ব্যাঙ্কার জুলিয়াসকে ল্যাবোরেটরিতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবে। নিজে চোখে দেখলে ওর বিশ্বাস হবে। তখন আর ওরা চাপ সৃষ্টি করবে না।

.

. হেয়ার কনডিশনারের চাহিদা অত্যন্ত কমে গেছে। ড্রাগস্টোর থেকে সব মাল ফেরত আসছে।

সেলস এগজিকিউটিভের মতে, আরও বিজ্ঞাপন প্রয়োজন।

না, তা সম্ভব হবে না। রিসের কণ্ঠে আপত্তি, বিজ্ঞাপনের বাজেট অনেক আগেই ছাড়িয়ে গেছে।

ড্রাগস্টোর থেকে সব মাল তুলে নিয়ে এসো। এলিজাবেথ বলল, এখন থেকে এই হেয়ার কনডিশনার শুধু বিউটি পার্লার ও সেলুনে পাওয়া যাচ্ছে, এইভাবে বিজ্ঞাপন দাও। এই ধরনের প্রোডাক্ট সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে। তাই বিক্রির হার কমে গেল। দুষ্প্রাপ্য, খুঁজতে হয়, এমন জিনিসই লোকে কিনবে।

অতএব দেখা গেল কয়েক দিনের মধ্যেই হেয়ার কনডিশনারের বিক্রি বেড়ে গেছে।

–তোমার মুখ যেমন সুন্দর, বুদ্ধিও তেমন। রিস্ বলল।

রিসের এত দিনে খেয়াল হল–মিসেস রিস্ উইলিয়ামস।

.

১১.

লন্ডন। শুক্রবার। ২রা নভেম্বর। বিকেল ৫টা।

ক্লাবের স্যানা বাথ জলীয় বাষ্পে ভরা। স্যার অ্যালেক নিকসের কোমরে তোয়ালে জড়ানো। হঠাৎ ঢুকল জন সুইনটন। বেঞ্চে বসল।

তুমি এখানে?

গুন্ডা সর্দারের ডানহাত জন সুইনটন চোখ টিপল–আমি তো জানি, তুমি আমার জন্যই অপেক্ষা করছ। তাই না?

না। ভিভিয়ানের জুয়ায় হেরে যাওয়া টাকা শোধের জন্য আমি সময় চেয়েছি।

–কিন্তু, তুমি তো বলেছিলে শেয়ার বিক্রি করার অনুমতি পাবে। শেয়ার বেচে টাকা শোধ করবে।

বলেছিলাম, কিন্তু এখন মত পাল্টেছে।

–ওকে রাজি করাও।

–চেষ্টা করছি। তবে–

তবে আবার কী? আর গ্যাসপট্টি খাইয়ো না।

জন সুইনটন ক্রমশ স্যার অ্যালেকের দিকে একটু একটু করে এগোতে থাকে।

–দেখো, তোমার সাথে আমরা ঝামেলা চাই না। পার্লামেন্টে তোমার মতো একজন ভালো বন্ধু থাকা দরকার। তবে সব কিছুর একটা মাত্রা আছে। স্যার অ্যালেক, আমরা তোমার একটা উপকার করেছি। এবার তোমার পালা। জাহাজে করে রফ অ্যান্ড সন্সের ওষুধ যায়। ওই সঙ্গে কোকেন চালান করে দাও।

–অসম্ভব। আমি পারব না। কিছুতেই না–

পেছনে সরতে সরতে অ্যালেক তখন বেঞ্চের শেষ প্রান্তে এসে পড়েছে। ওখানেই গরম পাথরে ভর্তি ধাতুর তৈরি গরম পাত্রটা আছে।

সাবধানে! অ্যালেক বলে ওঠে–খুব গরম!

জন অ্যালেকের হাতটা ধরে মুচড়ে দিল। তাকে গরম পাথরের দিকে নিয়ে গেল।

-না! অ্যালেকের হাতের নোম পুড়ছে।

তারপরেই গরম পাথরের মধ্যে চাপা পড়ল তার হাত। যন্ত্রণায় সে চেঁচিয়ে উঠল। মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়ল।

–আমি আবার আসব। পথ বাতলে রেখো।

সুইনটন চলে গেল।

.

১২.

বার্লিন, শনিবার, ৩রা নভেম্বর। সন্ধ্যা ৬টা।

অ্যানা রফ গ্যাসনারের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। সে নিজের বাড়িতেই বন্দি। বাড়ি সাফ করার জন্য সপ্তাহে একদিন ঝি আসে। অন্য দিনগুলোতে সে ও তার বাচ্চারা ওয়ালথারের কৃপাপ্রার্থী হয়। বাচ্চাদের ওর বাবা পছন্দ করে না, ঘেন্না করে।

বাচ্চাদের ঘরে বসে অ্যানা তাদের গানের রেকর্ড বাজিয়ে শোনাচ্ছিল।

ওয়ালথার এসে রেকর্ডটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। চিৎকার করছে সে-বাচ্চাদের আমি আর বরদাস্ত করতে পারছি না। ওদেরকে সরিয়ে ফেলতে হবে। আর সেইসঙ্গে এটাও আমি চাই না, ঘরের ব্যাপার বাইরের লোক জানুক।

গ্যাসনারের রুদ্র মূর্তি দেখে হঠাৎ অচৈতন্য হল অ্যান।

চেতনা ফিরলে সে দেখল, বিছানায় শুয়ে আছে। তখন সন্ধ্যা ছটা। ও বাচ্চাদের ঘরের দিকে তাকাল। তালা লাগানো। ওরা বেঁচে আছে, না মরে গেছে, বোঝা গেল না।

অ্যানা ফোন তুলে নিল–১১০। পুলিশ এমারজেন্সি! শিগগির এখানে আসুন।

ঝট করে ওয়ালথার তার থেকে রিসিভার কেড়ে নিল।

–আমার বাচ্চারা কোথায়? তুমি ওদের কী করেছ?

প্রশ্নের কোনো জবাব পেল না আনা।

.

বার্লিন ক্রিমিনাল পুলিশের সদরদপ্তরে এমারজেন্সি ফোনের সঙ্গে অটোমেটিক হোল্ড কানেকশন-এর ব্যবস্থা আছে। তাই ফোন কোথা থেকে আসছে, তা রেকর্ড হয়ে যায়।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে টেপ-রেকর্ডার নিয়ে ডিটেকটিভ পল ল্যানজ এল মেজর ওয়েজম্যানের অফিসে।

–ঠিক আছে।

–তাহলে সমস্যা কী?

–ওখানে গাড়ি পাঠাও। মেজর ওয়েজম্যান আদেশ দিল।

ওটা রফ অ্যান্ড সন্সের জার্মান শাখার প্রধান ওয়ালথার গ্যাসনারের বাড়ি। আপনার অনুমতি বিনা

একটু ভুল হলে তাদের দুজনকেই চাকরি থেকে বিদায় নিতে হবে, মেজর জানে।

–তুমি নিজেই যাও। তবে খুব হুঁশিয়ার।

.

দক্ষিণ-পশ্চিম বার্লিনের অভিজাত অঞ্চলে ওয়ালথার গ্যাসনারের বাস। নিরালা জায়গা। সুন্দর ঝকঝকে বাড়ি।

গোয়েন্দা মনে মনে বলল, রফ পরিবারের ক্ষমতা প্রচুর। এই পরিবারকে ঠকানো মানে দেশের সরকারের পতন। মেজরের সাবধানতার জন্য মনে মনে ধন্যবাদ জানালো।

অদ্ভুত অবিশ্বাস্য নৈঃশব্দ্য চারদিকে, কলিংবেল বাজল। দরজা খুলে গেল। সামনে মাঝবয়সী মহিলা। সাধারণ চেহারা, পরনে ড্রেসিং গাউন, কোঁচকানো।

ডিটেকটিভ ল্যানজ ভাবল, বাড়ির কাজের লোক হয়তো।

আমি পুলিশ ডিটেকটিভ ল্যানজ। মিসেস গ্যাসনারের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

–আমি মিসেস গ্যাসনার।

–আপনি পুলিশে ফোন করেছিলেন?

–হ্যাঁ, তবে ভুল করে।

তার মানে?

–ভেবেছিলাম গয়না হারিয়েছে, আসলে হারায়নি।

অথচ এমারজেন্সি নম্বর হত্যা বা ধর্ষণের জন্য।

আই সী। ডিটেকটিভ বলল।

–দুঃখিত।

ডিটেকটিভ বিদায় নিল।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ওয়ালথার এগিয়ে এল-খুব ভালো বলেছ তুমি। এবার ভেতরে এসো।

ওয়ালথার ওপর তলায় যাবার জন্য সিঁড়িতে পা রাখল।

আর ঠিক সেই সময়ে

ড্রেসিং গাউনের আড়ালে রাখা মস্ত বড়ো ধারালো কাঁচিটা বের করে অ্যানা বসিয়ে দিল ওয়ালথারের পিঠে।

.

১৩.

রোম। রবিবার, ৪ঠা নভেম্বর। দুপুর ১২টা।

বিখ্যাত তিভোলি উদ্যান। ইভো পালাজজি তখন বউ সিমনেত্তার হাতে হাত রেখে হাঁটছে। তিন মেয়ে ছোটাছুটি করে ফোয়ারা দেখে বেড়াচ্ছে।

আগে ইভো তার দ্বিতীয় পত্নী আর তিন ছেলেকে নিয়ে এখানে বেড়াতে আসত। কিন্তু এখন আর সে দোনাতেল্লার ছায়া মাড়ায় না। নিশ্চয়ই দোনাতেল্লা এজন্য অনুতপ্ত।

–ছেলেরা, এদিকে এসো।

পরিচিত কণ্ঠস্বর, ইভো পেছন ফিরে তাকাল। এবং আঁতকে উঠল। দোনাতেল্লা! ও সিমনেত্তার দিকে এগিয়ে আসছে। ও কি আজই সব কিছু বলে দেবে? সাংঘাতিক ব্যাপার! ছেলেরা যদি তাকে বাবা বলে ডেকে ফেলে, তাহলে ওকে ফোয়ারার জলে প্রাণ দিতে হবে।

-তাড়াতাড়ি চলো। আশ্চর্য একটা মজার জিনিস দেখা যাবে।

ইভো, সিমনেত্তা আর মেয়েরা ছুটছে।

এবার হাঁটি। সিমনেত্তা বলল।

-না, তাহলে মজাটাই হারিয়ে যাবে। কুইক।

ছুটতে ছুটতে আমার বুঝি হার্ট অ্যাটাক হবে, ইভোর ভাবনা। আমার মৃত্যু হবে। গড় ড্যাম! মেয়েদের বিশ্বাস করা যায় না। উলঙ্গ দোনাতো যখন তার ওপর চেপে বসত... ভাবতে গিয়ে এই বিপদের মধ্যেও তার দণ্ডটা শক্ত হয়ে উঠল।

ইভো, এবার দাঁড়াও।

–না, থামা চলবে না।

আমরা কোথায় যাচ্ছি?

–বাবা, আমরা তো এখুনি এখানে এলাম।

–মেয়েরা কথা বোলো না। জোরে জোরে দৌড়োও।

ইভো তার পুরো পরিবারকে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

এবার মজাটার কথা বলি। ইভো ধাতস্থ হয়েছে। আমরা হ্যাঁসলারে যাচ্ছি, ডিনার খেতে।

সামনে পিকচার উইনডো, দূরে সেন্ট পিটারের গির্জা। ভালো ভালো খাবার সবাই তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে, ইভো ছাড়া। তার মনে হল সে যেন শুকনো চামড়া চিবোচ্ছে।

তার মন খারাপ। দোনাতেল্লার চাহিদা মতো টাকাটা মিটিয়ে না দিলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। সিমনেত্তাকেও সব বলে দেবে।

অতএব, যেভাবে হোক টাকাটা তাকে জোগাড় করতেই হবে।

.

ঘরে ঢুকেই শার্ল মারতেইল ঘাবড়ে গেল। পিয়ের আর হেলেন মুখোমুখি বসে আছে। ওহ নো! পিয়েরকে দিয়েই শার্ল হেলেনের গয়নার কপিগুলো করিয়েছে।

-শার্ল এসো। মসিয় পিয়েরকে তুমি তো চেনো। উনিও তোমাকে জানেন। ওঁকে দিয়েই তুমি আমার গয়নাগুলোর নকল বানিয়েছিলে। আসলগুলো হাতিয়ে নিয়ে টাকাটা পকেটে পুরেছ।

শার্ল বড্ড ভয় পেয়ে গেছে। প্যান্ট তার ভিজে গেছে।

হেলেনের সামনে দাঁড়াতে তার লজ্জা হল। সে এখন পালাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু কীভাবে? হেলেনের দয়ামায়া নেই। আরও যদি একবার জানতে পারে, ওকে ছেড়ে শার্ল চলে যাবার ধান্দা করেছিল তাহলে...

–মসিয় পিয়ের, আপনি এখন আসতে পারেন।

হেলেন এক নিষ্ঠুর বিচিত্র স্বভাবের মেয়ে। এমন কোনো কাজ নেই, যা ও করতে পারে না।

শার্ল, আমার গয়না বিক্রি করে তুমি টাকা পেয়েছ। রসিদগুলো আমি রেখে দিচ্ছি। ফটোস্ট্যাট কপি। তুমি জানো, এর জন্য দশ বছর জেলের ঘানি তোমাকে ঘোরাতে পারি। জুয়েলার, আপনি একথা নিয়ে কানাকানি করবেন না। আমি ভেবে দেখি

–বেশ। আমি এখন যাচ্ছি।

– জুয়েলার চলে গেল।

হেলেন স্বামী শার্লের দিকে তাকাল। কী যেন গন্ধ! ভয়ের! ভয়ে শার্ল প্যান্টে পেচ্ছাপ। করে ফেলেছে?

হেলেন মনে মনে খুশি হয়েছে মনের মতো বর পেয়েছে সে। শার্লের নিজস্ব অস্তিত্ব কিছু নেই। হেলেন সব ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। শার্ল এখন বউয়ের চাকর। রফ অ্যান্ড সন্সের শাখা প্রধান শার্ল নামেই, চলে হেলেনের নির্দেশে।

ব্লাডলাইন!

হেলেন রফ-মারতেইলের রক্তে রফ পরিবারের আভিজাত্য। এমনিতেই ও টাকার পাহাড়। আগের ডিভোর্সের দরুন আরও টাকা তার হাতে এসেছে। কিন্তু টাকার ওপর তার লিপ্সা নেই। তার চাই ক্ষমতা। সে রফ অ্যান্ড সন্সের সর্বেসর্বা হতে চায়। সে ঠিক করেছে, নিজের শেয়ার বেচে দিয়ে, অন্যদের শেয়ার কিনে নেবে। কোম্পানিকে চালানোর জন্য সে নকশা তৈরি করবে। এব্যাপারে তার বন্ধুরা সাহায্য করবে।

স্যাম রফ কোম্পানির শেয়ার বেচার বিরোধিতা করে এসেছে। আজ সে বেঁচে নেই। এখন এসেছে তার মেয়ে এলিজাবেথ রফ। সেও চায় না, শেয়ার বাইরে বিক্রি হোক। কিন্তু হেলেন রফ মারতেইল জীবনে যা চেয়েছে তাই পেয়েছে। কোনো বাধা তার পথ রোধ করতে পারেনি। এ ব্যাপারে শার্লকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। প্ল্যানমাফিক কাজ না করলে শার্ল নিজেই বিপদে পড়বে।

অবশ্য এসব করার জন্য চাই শার্লের শক্তি ও উদ্যম।

-শার্ল, তুমি আমার গয়না চুরি করার অপরাধে দশবছর কারাদণ্ড ভোগ করতে পারো। যদি আমি চাই। তুমি কি বাঁচতে চাও?

হ্যাঁ।

হেলেন পোশাক খুলে উলঙ্গ হল।

ওহ ভগবান, এখন এই নোংরা মেয়েমানুষটার সঙ্গে বিছানায় যেতে হবে? বিকৃত রুচির মহিলা, পুরুষের ওপর নিষ্ঠুর পাশবিক অত্যাচার করে মজা পায় হেলেন।

-শার্ল, তোমায় বাঁচাব তো?

–হ্যাঁ।

-তা হলে শোনো। রফ অ্যান্ড সন্স আমার কোম্পানি। এলিজাবেথের শেয়ারগুলো আমি কিনে নিতে চাই।

-তুমি তো জানো, ও শেয়ার বিক্রি করতে রাজি নয়।

হেলেন উঠে দাঁড়াল। স্লিম সুন্দর নগ্ন শরীর। তার বুকের বোঁটা দুটো শক্ত হয়ে উঠেছে।

–এলিজাবেথের ব্যাপারে কিছু একটা করতে হবে এবং তোমাকেই। মনে রেখো, না হলে বিশ বছরের জেল। নার্ভাস হয়ো না। আমার নির্দেশ মতো সব কিছু করবে। আগে পোশাক খোলো।

.

১৪.

এমিল জেপলির ল্যাবরেটরিতে লিজা রফ ঢুকল।

একটা খাঁচায় চারটে খরগোশ লাফালাফি করছে।

অন্য একটি খাঁচায় চারটে খরগোশ চুপচাপ বসে আছে।

–এরা সুস্থ আছে? লিজ বলল, অবশ্য ওদের তুলনায় প্রাণশক্তি কম।

–এরা কনট্রোল। এরা ওষুধ পায়নি। এদের বয়স কম। আর যে খরগোসগুলো লাফাচ্ছে, ওদের বয়স বেশি, ওরা ওষুধ পেয়েছে।

লিজা অবাক!

যাদের ওষুধ দেওয়া হয়নি, তারা কেমন প্রাণশক্তিতে ভরপুর।

মানুষের ওপর পরীক্ষা কবে হবে?

একমাস পর।

এমিল, একথা কারো কাছে প্রকাশ কোরো না।

–মিস রফ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি একাই সব করছি।

.

ডিনার শেষ। বোর্ড সদস্যরা ছুটল ট্রেন ও জেট ধরতে।

রিস্ উইলিয়ামস লিজার ঘরে ঢুকল। ওর কাজে সাহায্য করতে লাগল।

সময় এগিয়ে চলেছে তার নির্দিষ্ট গতিতে।

.

মাঝ রাত।

হঠাৎ রিস বলল–একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল।

লিজা জানে, ও একটা লাল চুলের সুন্দরী ব্রেনসার্জনকে ডেট করেছে।

-সরি রিস, তুমি এখন যাও, আমি আর মিস আরলিং পরে বেরোচ্ছি।

–গুড নাইট। সকালে দেখা হবে। রিস্ বিদায় নিল।

এমিল জেপলির সাফল্যের কথা রিসকেও বলেনি লিজা।

রাত একটা, কাজ শেষ। কোট ও পার্স নিয়ে সে ঘর থেকে বেরোল। প্রাইভেট এক্সপ্রেস লিফটের দিকে হাঁটছে। সঙ্গে মিস আরলিং।

ঠিক সেই সময় অফিসের ফোন বেজে উঠল।

–আপনি এগিয়ে যান। আমি দেখছি। মিস আরলিং বলল।

.

নীচের তলার লবিতে রাতের প্রহরী লক্ষ করছিল, মিস লিজা রফের প্রাইভেট এক্সপ্রেস লিফট নীচের দিকে নেমে আসছে। কন্টোল বোর্ডের লাল আলোটা দেখল সে। আলোটা নামছে। এলিজাবেথের ড্রাইভার নীচে গাড়িতে বসে আছে।

ঠিক সেই সময়

ঠিক সেই সময় সজোরে বিপদসূচক ঘণ্টা বেজে উঠল।

কনট্রোল বোর্ডে দেখা যাচ্ছে, লাল আলোটা অতি দ্রুত নীচের দিকে নামছে।

অর্থাৎ কনট্রোল বিকল। লিফট খারাপ হয়ে গেছে।

প্রহরী ছুটে এল কনট্রোল বোর্ডের কাছে। এমারজেন্সি সুইচ টিপল। সেফটি ব্রেক চালু করার চেষ্টা করল। না, কোনো লাভ হল না। লাল আলো প্রচণ্ড গতিতে তখন নেমে আসছে।

কনট্রোল বোর্ডের সামনে এসে পড়েছে ড্রাইভার কী হয়েছে?

লিফট ভেঙে পড়বে সরে যাও।

]দুজনেই দূরে সরে গেল।

তখন লিফটের প্রচণ্ড গতির তাড়নায় লবি থরথরিয়ে উঠছে।

প্রহরী মনে মনে প্রার্থনা করল–মিস রফ যেন এই লিফটে না থাকেন।

মুহূর্তখানেক পরেই শোনা গেল বিকট আওয়াজ।

সঙ্গে মহিলার গলার আর্ত চিৎকার।

বাড়িটা কেঁপে উঠল, যেন ভূমিকম্প।

.

১৫.

জুরিখ ক্রিমিনাল পুলিশের চিফ ইন্সপেক্টর অটো স্মিয়েও চোখ বন্ধ করে ডেস্কের সামনে বসে আছেন। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন, যেন যোগাভ্যাস করছেন। আসলে তিনি প্রচণ্ড রেগে গেছেন।

পুলিশের কাজের ব্যাপারে কিছু নিয়ম এতই স্বাভাবিক ও সহজবোধ্য যে ওগুলো পুলিশ ম্যানুয়েলে লিখে রাখার কথা কেউ ভাবেনি। এ যেন খাওয়া, ঘুম, নিঃশ্বাস নেওয়ার মতোই স্বাভাবিক।

যেমন-পুলিশ খবর পেল, অ্যাক্সিডেন্টে কেউ মারা গেছে। ডিটেকটিভের কাজ কী? ডিটেকটিভ ঘটনাস্থলে যাবে। এটাই সহজ কথা। অথচ ডিটেকটিভ ম্যাক্স হরনাং রিপোর্টে লিখেছেন, এই সহজ কাজটা উনি করেননি।

হারম্যান মেলভিলের উপন্যাসের কথা মনে পড়ল তার। সেখানে নাবিকের কাছে যেমন আলবাট্রস, তেমনি চিফের কাছে ডিটেকটিভ ম্যাক্সও একইরকম ভীতিপ্রদ।

আবার জোরে নিঃশ্বাস নিলেন চিফ ইন্সপেক্টর। উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হল। ম্যাক্সের রিপোর্টটা মেলে ধরলেন চোখের সামনে–

ব্রানডটুর অফিসার রিপোর্ট

বুধবার, ৭ই নভেম্বর। সময় : রাত ১টা ১৫ মিনিট।

বিষয় : রফ অ্যান্ড সন্সের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর সেন্ট্রাল সুইচ বোর্ড থেকে রিপোর্ট। দুর্ঘটনার কারণ, ধরন, আহত ও নিহতের সংখ্যা লেখা হল না।

সময়–১টা বেজে ২৭ মিনিট। রফ অ্যান্ড সন্সের সুইচ বোর্ড থেকে দ্বিতীয় ফোন। লিফট ভেঙে পড়েছে। কারণ জানা যায়নি। নিহত–একজন, মহিলা।

আমি অনুসন্ধান চালাতে শুরু করলাম সঙ্গে সঙ্গে। সময় : রাত ১টা ৩৫ মিনিট। বিল্ডিং এর প্রধান স্থপতির নাম আমি ওই অফিসের সুপারিন্টেডেন্টের কাছ থেকে ফোনে জেনে নিই।

সময় : রাত ২টা ৩০ মিনিট। প্রধান স্থপতিকে ফোন করলাম। লা পুসে তিনি একটা জন্মদিনের উৎসবে ছিলেন। তিনি সেই লিফট কোম্পানির মালিকের নাম জানালেন রুডলফ শ্যাজ।

সময় : রাত ২টা ৪৫ মিনিট। রুডলফকে ফোন করলাম। লিফটের প্ল্যান, মাস্টার বাজেট শীট, ফাইনাল এস্টিমেট, ব্যবহৃত মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতির তালিকা চাইলাম।

সময় : সকাল ৫টা ৪৫ মিনিট। রুডলফের স্ত্রী ওগুলো পুলিশ স্টেশনে দিয়ে গেলেন।

আমি ওগুলো পরীক্ষা করে দেখেছি।

–লিফট তৈরিতে ভালো যন্ত্রপাতিই ব্যবহার করা হয়েছে।

–বিখ্যাত নামজাদা কোম্পানি; অতএব কাজে কোনো গলতি থাকবে বলে মনে হয় না।

লিফটের নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল। তাই বলা যায়, এটা দুর্ঘটনা নয়।

(সই)
ম্যাক্স হরনাং, সিআইডি

বিশেষ দ্রষ্টব্য-মাঝরাতে ও ভোরে ফোন করে বিরক্ত করা হয়েছে বলে অনেকে নালিশ করতে পারে।

.

অভিযোগ আসতে আর কী বাকি আছে! সারা সকাল ধরে ফোন আসছে, সুইস সরকারের অফিসারদের।

–এটা পুলিশ হেড কোয়ার্টার, নাকি গেস্টাপো অফিস?

–গভীর রাতে বিখ্যাত বিল্ডিং করপোরেশনের মালিককে ঘুম থেকে তুলে কাগজপত্র চাওয়ার অর্থ কী?

রুডলফ শ্যাজের মতো কোম্পানির মুখে চুনকালি ছেটাতে চাইছেন কেন?

আরও কত!

তার চেয়েও তাজ্জব ব্যাপার। চোদ্দো ঘন্টা পর ডিটেকটিভ ম্যাক্স ঘটনাস্থলে হাজির হয়েছে। ততক্ষণে অন্য ডিটেকটিভরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলে গেছে। তারা সাক্ষীদের জেরা করেছে। ডেডবডি পোস্টমর্টেম করতে পাঠিয়ে দিয়েছে।

রিপোর্টের ওপর আর একবার চোখ বোলান চিফ ইন্সপেক্টর। তারপর ম্যাক্সের তলব পড়ল।

চিফ ইন্সপেক্টর এই লোকটাকে একটুও সহ্য করতে পারে না। ডিমের মতো টেকো মাথা। মাথা অনুযায়ী কান দুটো বিশ্রী রকমের ছোটো। লাল ছোটো ঠোঁট দুটো যেন পুডিং এর মাঝখানে লাগানো কিসমিস। পুলিশদের দেহের উচ্চতা যতটা লাগে, তার থেকে দু ইঞ্চি বেঁটে। যতটা ওজন দরকার, তার থেকে ১৫ পাউন্ড কম। খালি চোখে দূরের জিনিস দেখতে পায় না। লোকটা অদ্ভুত মার্কা। উদ্ধত প্রকৃতির। চিফ ইন্সপেক্টর শুধু নয়, পুলিশ ফোর্সের কেউ তাকে দু চক্ষে দেখতে পারে না।

–ওকে চাকরি থেকে বসিয়ে দিচ্ছো না কেন?

জানতে চেয়েছিল চিফ ইন্সপেক্টরের বউ। সেদিন বউয়ের ভাগ্য ভালো ছিল, না হলে মারধোর খেয়ে যেত।

তা সত্ত্বেও পুলিশ ডিপার্টমেন্টে ম্যাক্স চাকরি পেয়েছে। কারণ, ওর জন্যই সুইজারল্যান্ডের জাতীয় আয় অনেক বেড়ে গেছে। চকোলেট বা ঘড়ির কোম্পানিও এত লাভ করে না।

ম্যাক্স হরনাং, পেশায় হিসাবকক্ষক। অঙ্কশাস্ত্রে তার বিশেষ জ্ঞান আছে। কেউ বেআইনি । কাজ করে ওর হাত থেকে নিস্তার পায় না। আর যেটা হল অঢেল আছে তার–ধৈর্য। বাইবেলের জব নামের চরিত্রও বুঝি তার কাছে মাথা হেঁট করবে।

একসময় ম্যাক্স সরকারি অফিসের কেরানি ছিল। সরকারকে যারা অর্থনৈতিক ব্যাপারে কঁকি দিচ্ছে, তাদের ব্যাপারে তদন্তকারী বিভাগে ম্যাক্স কাজ করত। এই বিভাগের কাজ হল শেয়ার বিক্রির ব্যাপারে ব্যাঙ্কের কাজকর্মে বা সুইজারল্যান্ড থেকে টাকা আনার ব্যাপারে কেউ ফেরেব্বাজি করছে কিনা, তা দেখা। ম্যাক্স তার অদ্ভুত প্রতিভায় সুইজারল্যান্ড থেকে অবৈধভাবে টাকা আসা বন্ধ করে দিয়েছিল। কয়েক কোটি ডলারের বেআইনি ব্যবসা ধরা পড়ল। ইওরোপের দুজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী কারাদণ্ড ভোগ করল। ম্যাক্সের শকুনের চোখ। টাকাপয়সা লুকিয়ে, মিশিয়ে বা অস্তিত্বহীন করপোরেশনের নামে ট্রান্সফার করে যেভাবেই। আনা হোক না কেন, তার নজর কেউ এড়াতে পারবে না। সে হল সুইস ব্যবসায়ীদের ত্রাস।

সুইসরা ব্যক্তিগতভাবে গোপনীয়তা পছন্দ করে। কিন্তু ম্যাক্স থাকলে, তা আর সম্ভব হয় না।

কেরানিগিরি করে ম্যাক্স অত্যন্ত কম টাকা মাইনে পেত। সে ঘুষ নেয় না। করটিনা দ্য আমপেজজাতে বাগানবাড়ি, নয়তো প্রমোদপোত, অথবা ছ-ছটি রূপসী সুন্দরী শয্যা

সঙ্গিনী ঘুষ হিসেবে দিতে চাওয়া হয়েছে। কিন্তু ম্যাক্স তা গ্রহণ করেনি। সে উল্টে তার ওপরওয়ালাকে সব বলে দেয়।

তবে তার শখ আছে–দুটো।

প্রথম শখ-বেআইনি কাজ যারা করে, তাদের হাতে নাতে ধরা।

দ্বিতীয় শখ-পুলিশ ডিটেকটিভ হতে চায় সে। সে পড়েছে স্যার আর্থার কোনান ডয়েল ও জর্জ সিমের গোয়েন্দা উপন্যাস। সেখান থেকেই অপরাধীকে হাতেনাতে ধরার বুদ্ধি তার মাথায় চেপেছে।

ম্যাক্স-এর এই মনোবাসনার কথা জানতে পেরেছিল সুইজারল্যান্ডের এক ধনী ব্যবসায়ী, বন্ধুদের সহযোগিতায় সে ওপর মহলে এমন চাপ দিল, ম্যাক্স দু-দিনের মধ্যে ডিটেকটিভের চাকরি পেয়ে গেল। সুইস ব্যবসায়ীদের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

এ ব্যাপারে চিফ ইন্সপেক্টরকে পর্যন্ত কিছু জানানো হয়নি। সুইজারল্যান্ডের সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার নির্দেশেই সে চাকরিটা পেয়েছে।

এবং শুরু হল চিফ ইন্সপেক্টরের দুঃখের দিন।

ডিটেকটিভের কাজে কোনো প্রশিক্ষণ নেওয়া নেই, অথচ ডিটেকটিভ করা হল। তা হোক, শিখিয়ে পড়িয়ে নিলেই হবে। কিন্তু ম্যাক্স এমন হামবড়া ভাব দেখাল, যেন, আমি এসে গেছি, তোমাদের আর কোনো চিন্তা নেই।

চিফ ইন্সপেক্টর চটে গিয়ে তাকে কোনো ডিপার্টমেন্টেই স্থায়ীভাবে রাখে না। তবুও কি নিস্তার আছে? ফিঙ্গারপ্রিন্ট আইডেনটিফিকেশন, হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ, যেখানেই থাক না কেন, কোনো না কোনো ছুতো করে ঠিক সে এসে হাজির হবে। বারো সপ্তাহের মধ্যে একটা রাত হয়তো এমারজেন্সি ডেস্ক ডিউটি পেয়েছে ম্যাক্স। তখন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না কিছু ঘটবেই। রহস্য সমাধানের জন্য অন্য ডিটেকটিভরা যখন ছুটোছুটি করছে, তখন ম্যাক্স রহস্যের সমাধান করে ফেলেছে।

পুলিশের কাজকর্মের ধারা, ক্রিমোনোলজি, ফরেন্সিক, স্ট্যাটিসটিক্স, ক্রিমিনাল সাইকোলজি কিছু জানে না ম্যাক্স। অন্যান্য ডিটেকটিভরা যখন ব্যর্থ, তখন সফল হয়ে ফিরে এসেছে ম্যাক্স। এ ব্যাপারে চিফ ইন্সপেক্টর ওর সৌভাগ্যকে দায়ী করে।

ভাগ্য টাগ্য বাজে কথা। ম্যাক্স যে স্কিমে ব্যাঙ্ক বা সরকারকে ঠক ব্যাপারগুলি ধরত, সেইভাবেই ক্রিমিনাল কেসের সমস্যা সমাধান করে।

ওর মন সোজা পথে কখনও হাঁটে না। সব সময় বাঁকা ও সংকীর্ণ পথ ধরে ছোটে। আর এতই অসম্ভব স্মৃতিশক্তি তার, ফটোগ্রাফিও লজ্জা পায়।

প্রথমদিন ম্যাক্সের এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট দেখে অফিসার বলেছিল, তোমার হিসেবে মনে হয় ভুল আছে।

দাবা খেলোয়াড় ক্যাসাব্ল্যাঙ্কাকে বলো, তার বোকামির জন্য দাবার রানি কুপোকাত হয়েছে আর ম্যাক্সকে বলল, সে হিসেবে ভুল করেছে, ওই একই ব্যাপার।

কুতকুতে চোখে তাকিয়ে ম্যাক্স বলে ওঠে–তাই নাকি?

-হ্যাঁ, যাতায়াত খরচ দেখিয়েছ যেতে আশি সেন্টিমে, এবং আসতেও তাই। অথচ একপিঠের ট্যাক্সি ভাড়া লাগে চৌত্রিশ ফ্রা।

–হ্যাঁ, স্যার। তাই আমি বাস ধরেছি।

কী দরকার? অন্য ডিটেকটিভরা...এছাড়া তিন দিনের খরচ?

-সকালের ব্রেকফাস্ট কেবল কফি। লাঞ্চ তৈরি করে নিয়ে যাই। তাই শুধু ডিনারের খরচ লিখেছি।

তিনটে ডিনারে ষোলো ফ্রাঁ মাত্র খরচ। ম্যাক্স কি স্যালভেশন আর্মির কিচেনে খেতে যায়!

–ম্যাক্স, একশো বছর আগে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ছিল, একশো বছর পরেও থাকবে। এখানকার কতকগুলো ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য আছে। তাছাড়া সহকর্মীদের কথাও ভাবতে হবে। ধরো, এটা ঠিক করে ফেরত দাও।

-ইয়েস স্যার। যদি ভুল হয়ে থাকে..

–ঠিক আছে। তুমি তো নতুন ঠিক করে লেখো।

ম্যাক্স আধঘণ্টা পরে আবার এল। ভাউচার জমা দিল। দেখা গেল আগের থেকে শতকরা আরও তিনভাগ কমিয়ে দিয়েছে।

চিফ ইন্সপেক্টরের ঘরে ঢুকল, পরনে গাঢ় নীল স্যুট, পায়ে বাদামি রঙের জুতো আর সাদা মোজা।

অ্যাক্সিডেন্টের খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তুমি ঘটনাস্থলে যাওনি কেন? চোদ্দো ঘণ্টা পর গেলে? এর মধ্যে নিউজিল্যান্ডের পুরো পুলিশ ফোর্স ঘটনাস্থলে এসে ফিরে যেত।

–সেটা হত না স্যার। প্লেনে জুরিখে আসতে নিউজিল্যান্ড থেকে সময় লাগে...: ।

–চোপ! এই ধরনের কাজ আমি মোটে পছন্দ করি না। অন্য ডিটেকটিভরা ঘটনাস্থলে গেল, বডি মর্গে চলে গেল, আর তুমি অফিসে বসে রাতদুপুরে ফোন করে করে সুইজারল্যান্ডের প্রভাবশালী লোকেদের ঘুম ভাঙালে, আর সারা সকাল ধরে তোমার অকর্মণ্যতার খেসারত দিতে হল আমাকে! ক্ষমা চাইতে হল!

–আমি জানতে চাইছিলাম...।

–স্টপ! একটাও কথা নয়। গেট আউট!

–ইয়েস স্যার। তবে জানতে চাইছিলাম মৃতদেহ কবরস্থ করার অনুষ্ঠানে যাব কি না?

-হ্যাঁ, যাবে।

–থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

চিফ ইন্সপেক্টর এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন।

.

১৬.

শিহলফেলডের কবরখানা।

থিকথিক করছে ভিড়।

শ্বেতপাথরের পুরোনো বাড়ি।

দুজন অফিসার ও কর্মচারী–রফ অ্যান্ড সন্সের তরফে। এছাড়া বন্ধুবান্ধব ও সাংবাদিকরা।

পেছনের সিটে বসে আছে ম্যাক্স। সে ভাবছে, এই মৃত্যুর কোনো যুক্তি নেই। যখন বেশি কিছু দেওয়ার, বেশি কিছুর জন্য পাওয়ার সময়, সেই যুবক বয়সে মৃত্যু কখনোই কাজের কথা নয়।

ফুলে ফুলে ঢাকা মেহগিনির কফিনের দিকে তাকাল ম্যাক্স। পয়সা ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নয়। অ্যাক্সিডেন্টে মৃতদেহ তালগোল পাকিয়ে গেছে। তাই কফিন সীল করে দেওয়া হয়েছে।

পাদ্রির কণ্ঠস্বর শোনা গেল–জীবনের উৎসভস্ম; ভস্মেই মিশে যায়–যিনি জীবন দেন, সেই ঈশ্বরই তা গ্রহণ করে।

মিস এলিজাবেথ রফ, ম্যাক্স বলল, আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল।

–উনি এখন কোনো কথা বলতে পারবেন না। যা বলার পুলিশের কাছে বলে দিয়েছেন। রিস্ উইলিয়ামস আপত্তি জানাল।

–ঠিক আছে। বলুন, আপনি কী জানতে চাইছেন? লিজা বলল।

জীবনে এই প্রথম বোধ হয় ডিটেকটিভ ম্যাক্স কথা হারিয়ে ফেলেছে। মেয়েরা আবেগ বোঝে, যুক্তির ধার ধারে না। ওরা কম্পিউটারে ধরা পড়ে না, ম্যাক্স সেক্সের লজিক বোঝে। শরীরের চলন্ত অংশের মোগাযোগের ছন্দ তার কাছে ঠিক যেন কবিতা। কী অদ্ভুত ডাইন্যামিক্স! কবিরা আসল ব্যাপারের ধারেকাছেই যায়নি। আবেগ, ভালোবাসা ইত্যাদি কেবল শক্তির অপচয়। আবেগ এক কণা বালিও সরাতে পারে না, কিন্তু লজিক পারে।

এলিজাবেথকে এখন তার ভালো লাগছে। কারণ সে তাকে কুতসিৎ হাস্যকর বেঁটে বলে এড়িয়ে যাচ্ছে না।

–মিস রফ, আপনি তো অফিসে অনেক রাত পর্যন্ত থেকে কাজ করতেন। সকলেই তা জানে, তাই তো? দুর্ঘটনার দিন রাতেও আপনি ও মিস্টার উইলিয়ামস একসঙ্গে বেশি রাত পর্যন্ত কাজ করেছেন। উনি আপনাকে একা রেখে চলে গেলেন কেন?

–একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। রিস্ জবাব দিল।

কতক্ষণ আগে বেরিয়েছিলেন?

–এক ঘন্টা।

মিস রফ, আপনি আর মিস আরলিং একঘন্টা পর বেরিয়েছিলেন। তারপর?

তারপর স্পেশ্যাল এক্সপ্রেস লিফটে উঠতে যাব, এমন সময় ফোন বেজে উঠল। মিস আরলিং ফোনটা ধরতে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমি ব্যক্তিগত ওভারসীজ কলের আশায় নিজেই গেলাম। তারপরেই শুনলাম বীভৎস আর্তনাদ।

রিস জানতে চাইল–এত প্রশ্নের কী দরকার?

ম্যাক্স তখন ভাবছে–এটা একটা খুন, দুর্ঘটনা নয়। মিস এলিজাবেথকে কেউ খুন করতে চেয়েছিল। গত দুদিন ধরে এই কোম্পানি সম্পর্কে সে অনেক খবর সংগ্রহ করেছে। কোম্পানির হাজার ঝামেলা-মামলা, অপপ্রচার, ব্যাঙ্কের ঋণ ইত্যাদি ইত্যাদি। মৃত প্রেসিডেন্ট স্যাম রফ অভিজ্ঞ পর্বতারোহী ছিলেন। তবুও দড়ি ছিঁড়ে মারা গেলেন। এখন মেয়ে এলিজাবেথ বেশির ভাগ শেয়ার পেয়েছে।

প্রথমে সার্ডিনিয়ায় জীপ অ্যাকসিডেন্ট। দ্বিতীয় আক্রমণ, লিফট ভেঙে পড়া। কেউ ওকে খুন করার মারাত্মক খেলায় মেতে উঠেছে। এখন এলিজাবেথ রফ ওর কাছে কোনো নাম। নয়, কোনো অঙ্কের ধাঁধা নয়। ওকে বাঁচাতে ইচ্ছে করছে তার।

রিস্ আবার বলল–এসব প্রশ্ন কেন?

পুলিশের কঠিন নিয়ম, মিস্টার উইলিয়ামস। মাফ করবেন।

ম্যাক্স বিদায় নিল।

.

১৭.

প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে সকালটা কেটে গেল চিফ ইন্সপেক্টরের। সাইবেরিয়া এয়ারলাইন্সের সামনে গণবিক্ষোভ, তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ব্রুনাওয়ের কাগজকলে আগুন লেগেছে। সন্দেহজনক ঘটনা, খোঁজ নেওয়া চলেছে। প্ল্যাটসপিজ পার্কে বলাকার। গ্রিমা ও ওয়েবলিনে ছিনতাই।

ম্যাক্স তার মধ্যেই বলল–লিফটে কেবল ড্রাম ফাটা ছিল। তাই সেফটি কনট্রোল খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এর পেছনে কারো...

রিপোর্ট দেখেছি। ওটা ক্ষয়ে গিয়েছিল। তাই...

না, ওটা পাঁচ বছর চলার কথা।

–সাফ কথা বলো তো।

–কেউ লিফট বিকল করে দিয়েছিল।

–ওসব কিছু না, বাজে কথা। তাছাড়া কেউ এরকম কেন করবে?

–সেটা আমারও প্রশ্ন।

–বেশ তো রফ অ্যান্ড সন্সের অফিসে গিয়ে খোঁজ নাও।

না, ওখানে নয়, শ্যামনিকস-এ যাব।

.

শ্যামনিকস। জেনেভা থেকে চল্লিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে।

ম্যাক্স হাঁটছে। সে যাবে পুলিশ স্টেশন। হাতে কার্ডবোর্ডের দোমড়ানো সুটকেস।

ম্যাক্স ফরাসি ভাষার কথা বলতে শুরু করল। ফরাসি সার্জেন্ট তাজ্জব! তার মাতৃভাষা ফরাসি অথচ...

–আপনি কোন্ ভাষায় কথা বলছেন?

ফরাসি।

ম্যাক্স তার আইডেনটিটি কার্ড দেখাল-ডিটেকটিভ! এই লোকটা! আশ্চর্য!

–বলুন, আপনাকে কী সাহায্য করতে পারি?

–স্যাম রফের অ্যাক্সিডেন্ট সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে চাই।

–সোসাইতি শ্যামনিয়াদে সেস্যুর ঐ মানে, ফোন নম্বর ৫৩-১৬৮৯, ব্যু দী ভ্যালের ক্লিনিক, ফোন নম্বর ৫৩১১২। দাঁড়ান লিখে দিচ্ছি।

দরকার নেই।

পুরো ঠিকানা ও ফোন নম্বর গড়গড় করে বলে গেল ম্যাক। তারপর সে চলে গেল। ফরাসি সার্জেন্ট তার চলে যাওয়ার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ।

.

সোসাইটির ডেস্কের পেছনে বসে আছে অ্যাথলেটিক টাইপের তরুণ।

–আমি ডিটেকটিভ ম্যাক্স হরনাং। স্যাম রফের অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারে খোঁজ নিতে এসেছি।

হ্যাঁ, উনি পর্বতে ওঠার সময় দড়ি ছিঁড়ে পড়ে গিয়েছিলেন খাদে। ডেডবডি উদ্ধার করা যায়নি। ওই দলে চারজন ছিল, মিস্টার রফ ও তার গাইড সবার পেছনে ছিলেন। উনি হারনেস ব্যবহার করছিলেন। কিন্তু দড়ি ছিঁড়ে যায়।

–গাইডের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

রেগুলার গাইড অসুস্থ ছিল। তাই ষাট মাইল দুরের লেজেটস গ্রাম থেকে তাকে আনা হয়েছিল। নাম হান্স বারজম্যান।

.

ক্লেইন শেইডস হোটেল।

ডেস্কে বসে ক্লার্ক। ম্যাক্স জানতে চাইল মিস্টার রফ কি এখানে একা ছিলেন?

না, সঙ্গে একজন ছিল।

–তার নাম?

ক্লার্ক লেজার খুলে নামটা বলে দিল।

.

ভক্সওয়াগন গাড়ির ভাড়া সবথেকে কম। ম্যাক্স ওই গাড়ি করে এল লেজেটস-এ। আল্পসের গায়ে ছোট্ট একটি গ্রাম, ছোটো কয়েকটা লজ, কয়েকটা দোকান আর পেট্রল পাম্প দেখা গেল।

লজে ঢুকে পড়ল ম্যাক্স। চুল্লির সামনে বসে কয়েকজন লোক তখন গল্পগুজব করছিল।

–এক্সকিউজ মি। আমি হান্স বারজম্যানের খোঁজ করছি। পর্বতারোহণের গাইড। এই গ্রামে থাকে?

এক বুড়ো চুল্লিতে থুথু ফেলল। বলল–মিস্টার, কেউ হয়তো তোমার সঙ্গে মজা করেছে। এই গ্রামেই আমার জন্ম। হান্স বারজম্যান নামে কেউ এখানে থাকে না।

.

১৮.

রফ অ্যান্ড সন্সের অফিস। এলিজাবেথ রফের নামে চিঠি। খামের ভেতরে মনগোলয়েড বিকৃত মস্তিষ্কের বীভৎস ফটো। সঙ্গে একটি চিঠি লিখেছে এক অভাগিনী মা

–তোমাদের ওষুধ খাওয়ার ফলে আমার বাচ্চা জনের এই অবস্থা। তোমাদের আমি প্রাণে মারব। খুন করব।

–ওষুধের লেবেল ভুল লাগানো হয়েছিল। রিস্ বলতে থাকে, তার ফল। অথচ ঘটনাটা ঘটে গেছে চার বছর আগে। মানুষই তো ভুল করে। আমরা যথেষ্ট সাবধানী ছিলাম। তা সত্ত্বেও প্রচুর টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া আগামী দু-বছরের মধ্যে রফ অ্যান্ড সন্সের প্রায় গোটা বারো ফ্যাক্টরিতে তালা ঝুলিয়ে দিতে হবে। কেননা এফ. ডি. ও এরোসল স্প্রে বন্ধ করে দিচ্ছে।

এলিজাবেথ রফ আপন মনে উচ্চারণ করল যদি যৌবনকে ধরে রাখার ওই অদ্ভুত ওষুধটা এখন বের হত

আরও খবর লিজাকে শোনানো হল–আজকের খবরের কাগজ জানিয়েছে, বেলজিয়ামে এক মন্ত্রীপত্নী মাদাম ভ্যানডেন লখ বেনেকসান ট্যাবলেট খেয়েছিলেন।

–আমাদের কোম্পানির?

–হ্যাঁ, আনটিহিটামিনিক। অ্যালার্জির ওষুধ। সতর্কতা হিসেবে লেবেলে লেখা আছে : ব্লাড প্রেসার বেশি এই ওষুধ খাওয়া নিষেধ হলো। অথচ ওই মহিলা নিষেধ অগ্রাহ্য করেছেন। অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। প্রাণের আশা কম। এ খবর সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। সমস্ত ওষুধের অর্ডার ক্যানসেল হয়ে যাবে। দু-বছরের আগে এফডিএ ইনভেস্টিগেশন শুরু হবে না। এখন আপাতত ওষুধটা বাজারে থাক।

–ওই ওষুধে আর কোনো লোকের ক্ষতির খবর?

কোটি কোটি লোক উপকৃত। কেবল দু-একজনের...

–এখুনি ওই ওষুধ বাজার থেকে তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করা।

–প্রচুর টাকা ক্ষতি হবে। অন্যভাবে...

–প্রয়োজন নেই।

–এর থেকেও খারাপ খবর আছে, লিজ ব্যাঙ্কাররা লোনের টাকা এখনই ফেরত চাইছে। রিস্ চলে গেল।

লিজা ভাবছে–আমার বাচ্চা জনের এই অবস্থার জন্য তোমাদের ওষুধই দায়ী।

মাদাম ভ্যানডেন লখ বেনেকসান ওষুধ খেয়ে জ্ঞান হারিয়েছেন, প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা।

ব্যাঙ্কাররা লোনের টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য চাপ দিয়েছে।

দেওয়ালে বৃদ্ধ স্যামুয়েল রফের পোর্ট্রেট। আত্মবিশ্বাসী এবং কর্মদক্ষ। কিন্তু সংশয় বা হতাশা কখনও কি তাকে গ্রাস করেনি? তবু লড়ে গেছে। লিজাও লড়বে। ব্লাডলাইন! স্যাম রফের উত্তরাধিকারের ধারা তার রক্তে প্রবাহিত।

পোর্ট্রেটটা একটু কাত হয়ে গেছে। লিজা সোজা করার চেষ্টা করতেই মেঝেতে পড়ে গেল। লিজার সেদিকে তাকাবার সময় নেই। পোর্ট্রেটের পেছনের দেওয়ালে টেপ দিয়ে আর্টকানো ছোট্ট একটা মাইক্রোফোন তার চোখ এড়িয়ে গেল।

.

ভোর চারটে।

বিজ্ঞানী এমিল জেপলি সমস্ত দিনরাত ল্যাবোরেটরিতে কাটাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ওষুধটা বাজারে বের করতে হবে। এর জন সে মোটা টাকা মাইনে পায়। সে স্যাম রফকে খুব পছন্দ করত। লিজা রফও খুব ভালো। এই কোম্পানিকে সে ভালোবাসে। তাই তো তার

উদয়াস্ত পরিশ্রম। এক্সপেরিমেন্টের রেজাল্ট খুব ভালো–আশাই করা যায়নি। খাঁচা বন্ধ জানোয়ারদের শরীরের গন্ধ আর ভিজে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার মধ্যে কখন যে ভোর হয়েছে, বৈজ্ঞানিকের তা খেয়াল নেই।

দরজায় পাহারায় আছে সেপ নোলান। সে দরজা খুলে জানতে চাইল–আর কতক্ষণ থাকবেন ডক?

-কিছু বলছ? ডক্টর এমিল জেপলি মাথা তুলল।

–আমি রেস্তোরাঁয় যাচ্ছি। আপনি কি স্যান্ডউইচ খাবেন?

আমার জন্য কেবল কফি এনো।

–ঠিক আছে। বাইরের দরজা তালাবন্ধ করে দিয়ে গেলাম। আমি এখুনি ফিরব। বিজ্ঞানী বোধহয় নোলানের শেষ কথাগুলো শুনতেও পায়নি। সে তখন রিসার্চ রিপোর্ট নিয়ে ব্যস্ত।

দশ মিনিট কেটে গেছে। দরজা খুলে একজন ঢুকল–এখনও কাজ করছ এমিল?

এমিল চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে দাঁড়াল ইয়েস স্যার।

-ফাউনটেন অফ ইউথ প্রোজেক্ট, টপ সিক্রেট?

মিস রফ তাকে সব কিছু গোপন রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এঁনার ক্ষেত্রে এই নিষেধ নিশ্চয়ই খাটে না। ওই আগন্তুকের দয়াতেই জেপলি এই কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছে।

সে স্মিত হেসে বলল–হ্যাঁ স্যার, অত্যন্ত গোপন।

–তা বেশ। কাজ কেমন এগোচ্ছে?

–খুব ভালো।

আগন্তুক খরগোশের খাঁচার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে খাবারের একটা ডিস মেঝের ওপর ফেলে দিল–সরি।

–আমি তুলে দিচ্ছি।

এমিল ডিসটা তোলার জন্য মাথা নীচু করল। ঠিক সেই মুহূর্তে তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করা হল। মাথাটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল এমিলের।

.

ভোর পাঁচটা। টেলিফোন সশব্দে বেজে উঠল।

এলিজাবেথ রফ ঘুম চোখে রিসিভার তুলে নিল।

ভেসে এল উত্তেজিত এক কণ্ঠস্বর–মিস রফ, ল্যাবোরেটরির সিকিউরিটি গার্ড বলছি। বিস্ফোরণে ল্যাবোরেটরি ধ্বংস হয়ে গেছে। একজন বিজ্ঞানী মারা গেছেন।

বিজ্ঞানীর নাম না বললেও এলিজাবেথের বুঝতে দেরি হল না কে সে।

.

১৯.

ডিটেকটিভ ম্যাক্স হরনাং একমনে মিস রফের কেসটা নিয়ে ভেবে চলেছে। ডিটেকটিভ ব্যুরোতে তখন নানা শব্দটাইপরাইটারের আওয়াজ, টেলিফোনের শব্দ, তর্কাতর্কি, আরো কত কী! ম্যাক্সের সেই একটা কম্পিউটার। সেই মন ডুবে আছে রফ অ্যান্ড সন্সের জটিলতার আবর্তে।

প্রতিষ্ঠাতা স্যামুয়েল রফ চেয়েছিল, কোম্পানির শেয়ার যেন বাইরে বিক্রি না হয়। ব্যাপারটা বুদ্ধিমানের, কিন্তু বিপদ আছে পদে পদে। ১৬৯৫-এ ইতালিয়ান ব্যাঙ্কার লরেনজো টোনটি টোনটাইন নামের একটা ইনসিওরেন্স স্কিম চালু করেছিল। তাতে অনেকে মিলে ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম দেবে। একজন মরলে ভাগ পাবে অন্য সবাই। এর ফলে অন্য মেম্বারদের খুন করার ব্যাপারটা লাভজনক হয়ে উঠেছিল। রফ অ্যান্ড সন্সের বোর্ডমেম্বাররা প্রত্যেকে কোটি কোটি ডলারের শেয়ারের মালিক অথচ একজনের আপত্তিতে শেয়ার পাবলিককে বেচা যাচ্ছে না। এটাও সমান বিপজ্জনক।

স্যাম রফ শেয়ার বিক্রি করতে রাজি ছিল না। ফলে তার মৃত্যু হল।

এলিজাবেথ রফও শেয়ার পাবলিককে বিক্রি করার ব্যাপারে বিরোধিতা করেছে। তাই দু-দুবার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। মরতে মরতে বেঁচে এসেছে। অ্যাক্সিডেন্ট-অ্যাক্সিডেন্ট আর অ্যাক্সিডেন্ট। সে এই শব্দটিকে মোটেও গুরুত্ব দেয় না।

সে চিফ ইন্সপেক্টরের ঘরে এসে ঢুকল।

-ম্যাক্স, চিফ ইন্সপেক্টর বলতে থাকে, স্যাম রফের গাইডের নামটা ভুল হয়েছে বলে স্যাম রফ খুন হয়েছে–পুলিশ ডিপার্টমেন্টে এ ধরনের অনুমানকে পাত্তা দেওয়া হয় না।

–রফ অ্যান্ড সন্সের ভেতরে নানারকম ঝামেলা, সমস্যা। স্যাম রফকে খুন করে কেউ হয়তো সমস্যার সমাধান চেয়েছিল।

চিফ ইন্সপেক্টর মনে মনে ভাবল, এসব ব্যাপারে ডিটেকটিভ ম্যাক্সের ব্যস্ত থাকা ভালো। ডিপার্টমেন্টের পক্ষে মঙ্গল। রফ পরিবারের ক্ষমতা সম্পর্কে সে অন্যান্য ডিটেকটিভদের সাবধান করে দিয়েছে। ম্যাক্স যদি ওদের পেছনে লেগে নিজের চাকরি খোয়ায়, তাতে চিফের কী দোষ? দরকার পড়লে সে বলে দেবে–ম্যাক্সকে জোর করে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এসব ভেবে চিফ বলল–ম্যাক্স, কেসটা তোমার, তাই যেমন খুশি সময় দিতে পারো।

ধন্যবাদ। খুশি মনে ম্যাক্স বিদায় নিল।

.

করিডরে দেখা হল করোনারের সঙ্গে রিভার পেট্রল নদী থেকে একটা মেয়ের লাশ পাওয়া গেছে। ম্যাক্স, তুমি একবার দেখে যাও।

মর্গ। ধাতুর ড্রয়ার। যুবতী মেয়ের লাশ। সোনালি চুল। বছর কুড়ি বয়স। নগ্ন শরীর, জলে ফুলে উঠেছে, গলায় লাল রিবন বাঁধা।

–মৃত্যুর আগে যৌন মিলন ঘটেছে, চিহ্ন আছে। করোনার বলতে থাকে, ফুসফুঁসে জল পাওয়া যায়নি। তার মানে কণ্ঠনালী টিপে খুন করা হয়েছে। অবশ্য কোনো আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি। একে আগে এমন কখনও দেখেছ?

-না।

ম্যাক্স তাড়াহুড়ো করে এয়ারপোর্টের দিকে রওনা দিল।

.

২০.

সার্ডিনিয়া কস্টম্পেরালডা এয়ারপোর্ট। সস্তায় ফিয়াট ৫০০ মডেলের একটা গাড়ি ভাড়া করে ম্যাক্স শিল্পনগরী ওলিবিয়াতে পৌঁছোল। সভ্যতার নিদর্শন-মিল, ফ্যাক্টরি, ভাঙাচোরা গাড়ির স্তূপ।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে চিফ অফ পুলিশ লুইজি ফেরাররা বসে। ম্যাক্স তার ওয়ারেন্ট কার্ড দেখাল। উল্টেপাল্টে দুবার দেখে নিয়ে চিফ ভাবল, সম্ভবত সুইজারল্যান্ডের পুলিশ বিভাগে ডিটেকটিভের অভাব লেগেছে।

-বলুন, কী সাহায্য করতে পারি?

ম্যাক্সকে ইতালিয়ান ভাষায় কথা বলতে দেখে চিফ বলল–ইংরাজিতে বলুন।

সব শুনে চিফ বলল–ও জীপ অ্যাক্সিডেন্ট। আমাদের মেকানিক গাড়িটা পরীক্ষা করেছে।

-আমি জীপটা একবার দেখতে চাই।

ডিটেকটিভ ব্রুনো ক্যামপানা ম্যাক্সকে নিয়ে গেল।

–আমরা তদন্ত করে দেখেছি, এটা দুর্ঘটনা।

–না। তা কী করে সম্ভব?

জীপটা দেখিয়ে মেকানিক বলল–এই কাজে আমি পঁচিশ বছর আছি। ফ্যাক্টরি থেকে বেরোবার পর এই গাড়ির ওপর ব্রেক নিয়ে কোনো কারসাজি করা হয়নি।

করা হয়েছে। তবে কীভাবে, সেটা জানতে হবে।

.

পান্না রং সমুদ্রের উপকূল।

ম্যাক্স দাঁড়িয়ে, আকাশপাতাল ভাবছে। নিজেই প্রশ্ন করছে, উত্তর খুঁজছে। এক্সপার্ট মেকানিক বলছে ব্রেক নিয়ে কোনো কারচুপি হয়নি। না, জীপটির ব্রেক নিয়ে অবশ্যই কারচুপি করা হয়েছে। মিস রফ গাড়ি চালাচ্ছিল এবং তাকে খুন করার চেষ্টা করা হয়।

পাথরের ওপর বসে চোখ বুজে ভাবছিল ম্যাক্স।

প্রায় কুড়ি মিনিট পর লাফিয়ে উঠল ম্যাক্স। ক্রিমিনালের বুদ্ধির তারিফ করতে হয়।

ওলিবিয়ার বাইরে গেল ম্যাক্স। তারপর পাহাড়ি অঞ্চলে। তারপর বিকেলে প্লেনে চেপে জুরিখে ফিরে এল। তাও ইকনমি ক্লাসে!

৪. আগুনে ঝলসে গেছে

২১.

আগুনে ঝলসে গেছে এমিল জেপলির দেহ। ফরমুলার হদিস মেলেনি।

সিকিউরিটি ফোর্সের প্রধানকে লিজা বলল–ল্যাবোরেটরিতে দিনরাত পাহারা থাকার কথা ছিল না?

-ইয়েস মাদাম।

–কতদিন ধরে ইনচার্জের দায়িত্বে আছো?

–পাঁচ বছর।

–তোমায় বরখাস্ত করা হল। কত জন কর্মচারী আছে তোমার?

–পঁয়ষট্টি জন।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাদের সরিয়ে নেবে।

মিস রফ, কাজটা কি ভালো হল?

–গেট আউট।

.

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের একটা কপি দেখিয়ে রিস উইলিয়ামস বলল, ওরা লিখেছে কোম্পানির অভিজ্ঞ প্রেসিডেন্ট প্রয়োজন।

ব্যাঙ্কার জুলিয়াস বাদরাট ফোন করে জানাল বিকেল চারটের সময় আসছি। মিস্টার জেপলির মৃত্যুতে দুঃখিত।

অথচ এমিল জেপলির নাম খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়নি।

–হাঙর রক্তের গন্ধ পায়। রিস্ বলে উঠল।

স্যার অ্যালেকের ফোন এল। ফাইন্যানসিয়াল টাইমস রফ অ্যান্ড সন্সের নানা সমস্যা নিয়ে মস্ত বড়ো হেডলাইন দিয়ে প্রবন্ধ ছাপিয়েছে। তাই অনেক অর্ডার বাতিল হয়ে যাচ্ছে। সে এখন কী করবে?

–পরে বলছি।

ইভো পালাজজি ফোনে জানাল, কয়েক ঘণ্টা আগে ইতালির এক মন্ত্রীকে ঘুষ নেওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘুষ হিসেবে টাকাটা আমাদের কাছ থেকেই ওই মন্ত্রী নিয়েছিল। ইতালির বাইরে যাবার সময় ইতালি সরকারের চাপে পড়ে এয়ারপোর্টে তাকে ধরা হয়।

–ঘুষ দেওয়ার কারণ?

–তাহলে ইতালিতে কারবার চালানো যেত না।

এখন কী হবে?

–ইতালিতে গরিব ছাড়া কেউ জেলে যায় না।

শার্ল ও ওয়ালথারও ফোনে জানাল–প্রেস কোম্পানির বিরুদ্ধে নানা কুরুচিকর মন্তব্য করছে। ক্রেতাদের আস্থা আমরা হারিয়ে ফেলছি। পাবলিককে শেয়ার বিক্রি করার এখনও সময় আছে। এরপরে এ সুযোটুকুও হারাতে হবে আমাদের।

.

মারিয়া মারতিনেলি। ইতালিয়ান মেয়ে।

সুইজারল্যান্ডে এলিজাবেথ রফ আর মারিয়া একই ক্লাসে পড়ত।

মারিয়া একজন মডেল। মিলানের এক ইতালিয়ান সংবাদপত্র প্রকাশকের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা চলছে। ও এখনও নিজকে চিঠিপত্র দেয়।

টেলিফোন বুক থেকে নম্বরটা নিয়ে লিজা তাকে ফোন করল।

হ্যাঁ, লিজা, টনি ডির্ভোস পেলেই আমরা বিয়েটা সেরে নেব।

–মারিয়া, আমার একটা কাজ করে দেবে।

তারপর এক ঘন্টার প্রতীক্ষা।

মারিয়া ফোন করল। টনি খবর নিয়ে জেনেছে, যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সে যে বিদেশে টাকা পাচার করছে, এ খবরটা পুলিশকে কেউ জানিয়ে দিয়েছিল।

–সে কে?

–ইভো পালাজজি!

.

রফ অ্যান্ড সন্সের ল্যাবোরেটরিতে বিস্ফোরণের ব্যাপারটা তদন্ত করে ডিটেকটিভ ম্যাক্স জেনেছে যে, ইচ্ছে করেই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল।

–বিস্ফোরফের নাম?

রাইলার টেন। সেনাবাহিনীতে সাপ্লাই করে রফ অ্যান্ড সন্স। এই বিস্ফোরক পদার্থ ওদের ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয়।

কোন্ শাখা?

.

বিকেল চারটে।

চেয়ারে বসে ব্যাঙ্কার জুলিয়াস।

মিস রফ, শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে আমরা ঋণের টাকা এখনই ফেরত চাইছি।

–এজন্য তিনমাস সময় দেওয়া হয়েছিল।

জানি, কিন্তু পরিস্থিতি পাল্টে গেছে।

রফ অ্যান্ড সন্স ছোটোখাটো কোনো কোম্পানি নয়।

–অস্বীকার করছি না। কিন্তু কোম্পানিতে অনেক ঝামেলা। সামলানোর মতো উপযুক্ত লোকের অভাব।

–যদি প্রেসিডেন্ট বদলে যায়?

–আমরা সে কথাও ভেবেছি। কিন্তু আপনার বোর্ডের বর্তমান সদস্যদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করতে পারে।

–রিস্ উইলিয়ামস হলে কেমন হয়?

.

২২.

টেমস মেরিন পুলিশ ডিভিসনের কনস্টেবল টমাস হিলার। তার এখন ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। কাল সে ভালো ঘুমোত পারেনি। ফ্লো তার বান্ধবী, প্রেমিকা। এবং তারা নিয়মিত শরীরে শরীর রাখে। কিন্তু কাল সারারাত ফ্লো চিল চিৎকার করায় সে কিছুই করতে পারেনি।

এখন টমাসের খিদে পেয়েছে। কীসের খিদে? যৌন খিদে। সে অতৃপ্ত। ফ্লো স্তনদুটো তুলে ধরে বিছানায় উলঙ্গ হয়ে শুলে কী হবে, যতবার টমাস এগিয়ে গেছে, ততবার চিৎকার করে সরিয়ে দিয়েছে।

হাওয়ার ঝাপটায় বৃষ্টির জল তিরিশ ফুট লম্বা পুলিশ বোটের হুইল হাউসে ঢুকে পড়েছে। টমাসের পোশাক ভিজে গেছে। টেমস নদীতে পাহারা দেবার কাজ টেমস ডিভিসনের। বিস্তৃতি ৫৪ মাইল–আর্টফোর্ড ক্রীক থেকে স্টেইনস ব্রিজ পর্যন্ত। আর আধঘন্টা। তারপর টমাসের ডিউটি শেষ। ফিরে গিয়ে খাওয়াদাওয়া সেরে ফ্লোর সঙ্গে বিছানায় যাবে। যৌনমিলনের পর ঘুমোবে।

নদীতে কাদাজল মিশেছে। বৃষ্টির জলে নদী ভরপুর।

ঠিক এইসময় স্টারবোর্ডের দশ গজ দুরে কী একটা ভেসে উঠতে দেখা গেল। মরা, বড়ো, সাদা মাছের মতো। বোটে তুললে গন্ধ ছাড়বে। বোটের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যাওয়াও

সম্ভব নয়। সময় নষ্ট হবে। তাহলে তার ফিরতেও দেরি হয়ে যাবে। তার চেয়ে কনস্টেবল, ওটার ব্যাপারে কিছু বলবে না। কিন্তু বলে ফেলল।

সার্জেন্ট, স্টারবোর্ডের কুড়ি ডিগ্রিতে মস্ত বড়ো মরা মাছের মতো নদীতে কী একটা ভাসছে।

একশো হর্সপাওয়ার ডিজেল ইঞ্জিন শ্লথ হল। বোটের গতি কমে গেল।

–কোথায়? সার্জেন্ট গাসকিনস জানতে চাইল।

–এই তো একটু আগেও দেখেছি। এখন দেখা যাচ্ছে না। সার্জেন্টও তাড়াতাড়ি ডিউটি শেষ করতে চাইল–কত বড়ো? নৌকোর পথ আটকে দেবার মতো?

হ্যাঁ।

কিন্তু পেট্রল বোট ঘুরতেই জিনিসটা দেখা গেল।

মাছ নয়–এক যুবতীর উলঙ্গ লাশ। মাথায় সোনালি চুল। গলায় লাল রিবন বাঁধা।

.

২৩.

এবং এই সময় ডিটেকটিভ ম্যাক্স ন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অফিসে এসে ঢুকল।

–এসব মার্ডার কেসে স্যার অ্যালেক নিকলসকে কি আপনি সন্দেহ করেন? ইন্সপেক্টর ডেভিডসন জানতে চাইল।

দুজন সম্ভাব্য অপরাধীর মধ্যে একজন।

-দেখা যাক সি-ফোর ক্রিমিনাল ইনটেলিজেন্স, সি-ইলেভেন ও সি-থারটিন ক্রিমিনাল ইনটেলিজেন্স বিভাগ কী বলে?

-স্যার অ্যালেক নিকলসের নামে কোনো পুলিশ রেকর্ড নেই। তবে আসল খবরের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

.

লন্ডনের বড়ো বড়ো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ম্যাক্স ফোন করেছে। প্রথমে কেউ সহযোগিতা করতে চায়নি। সবাই আতঙ্কিত। পরে যখন জানতে পারল স্যার অ্যালেক নিকলসের ব্যাপার সন্ধান করছে, তখন অনেকেই মুখ খুলল।

ব্যাঙ্ক, ফিনান্স কোম্পানি, ক্রেডিট রেটিং, ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স-কোনো অফিসেই ম্যাক্স কোনো মানুষের সঙ্গে কথ বলছে না। সে শুধু কম্পিউটারে চোখে রাখে।

.

ম্যাক্স কম্পিউটারের কনসোল বোর্ডে মেশিন নিয়ে নাড়াচাড়া করে, যেন কোনো সঙ্গীতজ্ঞ পিয়ানো বাজাচ্ছে। এ ব্যাপারে ম্যাক্স এক বিস্ময়!

ডিজিট্যাল, লো-লেভেল হাই-লেভেল, ফরট্রান, ফরট্রানফোর, আইবিএম ৩৭০, পিডিপি ১০ ও ১১, অ্যালগল ৬৮। ব্যবসার খাতিরে কোবোল। পুলিশের জন্য বেসিক। চার্ট ও গ্রাফের জন্য হাই স্পিড এপিএল। লিপস এপিভি এল-১, বাইনারী বোর্ডে সিপিভি ইউনিটকে ম্যাক্স প্রশ্ন করছে।মিনিটে ১১০০ লাইন করে উত্তর পাওয়া যাচ্ছে। জায়ান্ট কম্পিউটারগুলি এত খবর মজুত রেখেছে। আধুনিক সভ্য জগতে মানুষের গোপন নিরাপত্তা বলে কিছু নেই। কম্পিউটার সব খবর ফাঁস করে দেয়। প্রয়োজন শুধু ধৈর্য। যেমন–সোস্যাল সিকিউরিটি নম্বর, ইনসিউরেন্স পলিসি, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, ট্যাক্স দিয়ে থাকলে তার রসিদ বাড়ি মর্টগেজ দিলে, গাড়ি বা স্কুটার কিনলে, হাসপাতালে বা আর্মিতে রেকর্ড থাকলে, পাসপোর্ট বা টেলিফোন থাকলে, জন্ম, বিবাহ, এমনকি ডিভোর্স হলে সমস্ত রেকর্ড কম্পিউটার ধরে রাখে। শুধু খুঁজে নিতে হয়।

যেমন এখন দেখা যাচ্ছে, স্যার অ্যালেক নিকলসের বেশি অঙ্কের বেশ কয়েকটা বেয়ারার চেক। অ্যালেক কাকে টাকা দিচ্ছে ট্যাক্স? ব্যবসা? ব্যক্তিগত খরচ? –না!

মাংসের বিল, ডেন্টিস্টের বিল, হেয়ার ড্রেসারের বিল দেওয়া হয়নি।

মেয়েদের জন্য পোশাক কেনা হয়েছে সার লরেন্স আর জন বেটস থেকে।

হোয়াইটস ক্লাবে টাকা দেওয়া হয়েছে।

মোটর ভেহিকলস লাইসেনসিং সেন্টার।স্যার অ্যালেক বেনটলি আর মরিস গাড়ির মালিক।

মেকানিকের বল? -সাত বছরে কোনো বিল দেওয়া হয়নি।

স্যার অ্যালেক নিকলস নিজের গাড়ি নিজেই সারায়। গাড়ির যান্ত্রিক কলাকৌশল তার জানা আছে। এ মানুষের পক্ষে জীপের ব্রেক বিকল করে দেওয়া অসম্ভব কিছু নয়। লিফটের ড্রামও বিগড়ে দিতে পারে।

কম্পিউটার বলছে, স্যার অ্যালেকের আয় কম, অথচ ব্যয় বেশি।

জানা গেল, স্যার অ্যালেক সোহোর এক ক্লাবের মালিকের কাছ থেকে টাকা ধার করেছে।

লোকটার নাম টড মাইকেলস। সে বেশ্যার দালাল, মদ, হেরোইন, সুদখোর, ব্ল্যাকমেলার, মহাজন। বহুবার তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু প্রমাণের অভাবে শাস্তি দেওয়া যায়নি।

ম্যাক্স সোহোয় গেল। সন্ধান নিয়ে দেখা গেল, অ্যালেকের বউ ভিভিয়ান জুয়া খেলে ধার তৈরি করেছে।

ম্যাক্স নিঃসন্দেহ হল, স্যার অ্যালেক নিকলসকে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে। তার বর্তমানে অর্থের প্রয়োজন। লাখ লাখ ডলারের শেয়ার আছে তার। কিন্তু শেয়ার বিক্রিতে বাধা পাচ্ছে। অতএব স্যার অ্যালেককে খুনের ব্যাপারে সন্দেহের তালিকায় রাখা যেতে পারে।

.

এবার রিস্ উইলিয়ামস।

কম্পিউটার বলছে

সুপুরুষ, ওয়েলসে জন্ম, বয়স ৩৪। বিয়ে করেনি, রফ অ্যান্ড সন্সের একজন উঁচু দরের অফিসার। লন্ডনে সেভিংস অ্যাকাউন্টে পঁচিশ হাজার পাউন্ড, কারেন্ট অ্যাকাউন্টে আটশো, জুরিখের ব্যাঙ্কের সেফ ডিপোজিটে কত রেখেছে জানা যাবে না। না, মেয়েদের জন্য উপহার কেনার কোনো বিল নেই। ক্রিমিনাল রেকর্ড-নেই।

এইসব তথ্যের অন্তরালে সত্যিকারের রিস উইলিয়ামস লুকিয়ে আছে। ম্যাক্সের মনে পড়ল–এলিজাবেথ রফকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় ওই লোকটা আপত্তি করছিল। কেন? কাকে আড়াল করতে চাইছে? মিস রফকে? না, নিজেকে?

পুলিশ ডিটেকটিভ ম্যাক্স সেদিন সন্ধ্যায় রোমের দিকে যাত্রা করল।

.

২৪.

ভাইট্যাল স্ট্যাটিসটিক্স ও সিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডাটা থাকে আনাগ্রাফে.বিল্ডিং-এ। ম্যাক্স এখানে এসআইডি ও ব্যাঙ্ক কম্পিউটারের সঙ্গে কথা বলল। দশ বছর ধরে ইভো পালাজজি যে জীবন গড়ে তুলেছিল তা একদিনের মধ্যে ম্যাক্সের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

ইভো পালাজজির দুটো বউ, দুটো সংসার, দুটো অস্তিত্ব, দুটো জীবন।

আমিসির মুদির বিল, বিউটি সেলুনের বিল, ভায়াকনদত্তির দোকান থেকে–এনজেলো থেকে স্যুট, কারদুসি থেকে ফুল, আইরিন গ্যালিৎজিন থেকে দুটো ইভিনিং ড্রেস, ছটা বাচ্চার জন্য টিউশনে ফি।

ছটা বাচ্চা কেন?

আনাগ্রাফের কম্পিউটার বলছে, ইভোর তিনটি মেয়ে।

ওলিসিয়াটায় ইভোর বাড়ি। আবার ভায়া মতেমিয়াও-এ তার ফ্ল্যাট আছে।

ইভো পালাজজি নামে দুজন পুরুষ নেই। একজনই–দুটো সংসার। স্ত্রী সিমনেত্তা, তিনটি মেয়ে। রক্ষিতা দোনাতো, তিনটি ছেলে।

ইভো হাতের কাজ করতে ভালোবাসে। সম্প্রতি করাত ও যন্ত্রপাতি কিনেছে। স্থপতি হিসেবে ওর নামডাক আছে। লিফটের ব্যাপারেও নিশ্চয়ই কিছু জানা আছে।

কম্পিউটার তথ্য দিয়েছে ব্যাঙ্কের লোনের জন্য সে সম্প্রতি আবেদন করেছিল। পায়নি। ব্যাঙ্ক ওর স্ত্রীর সই চেয়েছিল। তাই আবেদন নাকচ হয়ে যায়।

এবার ইইউআর ও পলিজিয়া সায়েন্টিফিক সেন্টারের মস্ত বড়ো কম্পিউটার কী তথ্য দিচ্ছে দেখা যাক

ক্রিমিন্যাল রেকর্ড?

তেইশ বছর বয়সে মারামারি করার অপরাধে তাকে দুমাস জেল খাটতে হয়েছিল।

এছাড়া–

ভায়া মতেমিয়াও-এ ওর রক্ষিতার বাড়ির আশেপাশের লোকেরা ওদের নামে অভিযোগ করেছে–ভীষণ চেঁচামেচি, মারামারি হয়।

তার মানে ইভো আর দোনাতেল্লার মধ্যে তর্কাতর্কি, ঝগড়া, মারামারি হয়। জানা গেল, ইভোর রক্ষিতা এসব কথা ফাঁস করে দিতে চাইছে। টাকা চাইছে? তাই কি ব্যাঙ্কের ঋণের জন্য ইভো আবেদন করেছিল? ইভো পালাজজি, দাম্পত্য জীবন, সংসার টিকিয়ে রাখার জন্য বহুদূর যেতে পারে।

এয়ারপোর্টে যে লোকটাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তার কাছ থেকে পাওয়া টাকার : একটা অংশ পুলিশ ইভোকে উপহার হিসাবে দিয়েছে। এতোই টাকার দরকার তার?

ম্যাক্স আবার দুপুরে প্লেনে চড়ে প্যারীতে ফিরে এল।

.

২৫.

দ্য গল এয়ারপোর্ট থেকে নত্রদাম এল ম্যাক্স, বাসে। সাড়ে সাত ফ্রা খরচ হল। ট্যাক্সিতে এলে লাগত ৭০ ফ্রাঁ।

সস্তা দামের হোটেল যুবল-এ উঠল সে।

সে বিখ্যাত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ফোনে যোগযোগ করল। ব্যবসায়ীরা প্রথমে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ম্যাক্স মানেই ঝামেলা। ওর কাছে গোপনীয়তা বজায় রাখা যায় না। কিন্তু : যখন জানতে পারল, অন্যের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাচ্ছে ম্যাক্স, তখন তাদের মুখে হাসি।

–বেশ তো, আমাদের কম্পিউটারের সঙ্গে কথা বলল।

.

শার্ল ও হেলেন রফ মারতেইল সম্পর্কে কম্পিউটার জানালো–

রু ফ্রাঁসোয়া প্রিমিয়ার ফাইভ নম্বর বাড়ি। ২৪শে মে, ১৯৭০ সালে বিয়ে হয়েছে, কোনো সন্তানসন্ততি নেই। হেলেন এর আগে তিনবার বিয়ে করে ডির্ভোস করেছে। ব্যাঙ্কের। অ্যাকাউন্টটা হেলেনের নামে।

দেখা গেল শার্লের জন্য যা কিছু খরচ-জুতো, টুপি, পোশাক, রেস্তোরাঁর বিল–সবেতেই হেলেন সই করেছে।

আর কিছু?

ডাক্তারের বিল। ডাক্তারি রিপোর্টনার্ভাস ব্রেক ডাউন। উরু ও পাছায় কালশিটে ক্ষত। এর কারণ কী? জানা যায়নি।

আর?

আর চার মিলিয়ন ফ্রাঁ খরচ করে রেনে দীশাপ আর তার বন্ধু শার্ল দেসাঁ ওরফে শার্ল মারতেইল আঙুরের খেত কিনেছিল।

টাকা কোথা থেকে পেল?

মাসির বাড়ি থেকে।

তার মানে?

ওটা একটা ফরাসি গালাগাল। সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ধার নিয়েছিল।

লাভ পাওয়া গেছে?

না, ক্ষতি হয়েছে।

ইনসিওরেন্স কম্পিউটার জানালো, জুয়েলার পিয়েরের সাহায্যে শার্ল মারতেইল বউ হেলেনের সিন্দুকে রাখা দামি গয়নাগুলোর নকল করে আসলগুলোর বিক্রি করে দিয়েছিল। এর বিনিময়ে কুড়ি লাখ ফ্রাঁ পেয়েছিল শার্ল দেসাঁ ওরফে মারতেইল।

এছাড়া পাহাড়ে চড়ার একজোড়া জুতোর বিল রয়েছে।

কার জন্য? শার্লের জন্য? অবিশ্বাস্য! যে বউয়ের গয়না চুরি করে ব্যবসা করে, নিজের নামে যে একটাও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেনি, সে যাবে পাহাড়ে উঠতে? না, ব্যাপারটা কেমন গরমিল লাগছে।

বুটজোড়া কেনা হয়েছে টিমউয়্যার স্পোর্টস শপ থেকে।

জুতোর সাইজ দেখতে চাই।

স্ক্রিনে ভেসে উঠল–৩৬ সাইজের বুট। মেয়েদের।

তার মানে হেলেন রফ মারতেইল পাহাড়ে চড়ে এবং ওই সময় স্যাম রফ খুন হয়েছিল।

.

২৬.

প্যারীর রু আরমেগো। বিশেষ ঘিঞ্জি নয়। রাস্তার দুপাশের বাড়িগুলোর বেশির ভাগই একতলা আর দোতলা।

ইন্টারপোলের হেডকোয়ার্টার্স। ২৬ নম্বর। আটতলা বিল্ডিং। ইস্পাত, পাথর ও কাঁচ দিয়ে তৈরি। আন্তর্জাতিক ক্রিমিনাল ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সংগঠন।

ম্যাক্স জানতে পারল, ওপরে মাফ ফিল্ম দেখানো হচ্ছে।

–স্নাফ ফিল্ম কী?

তিনতলায় সিনেমার পর্দার সামনে বসে আছে ইন্টারপোলের সদস্যরা। ফরাসি পুলিশের ইন্সপেক্টর, সাধারণ পোশাকে পুলিশ ডিটেকটিভ এবং ইউনিফর্ম পুলিশরা।

ম্যাক্স পেছনের সিটে বসল।

রেনে আলমেইদি, ইন্টারপোলের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি।

তিনি বলতে থাকেন–গত কয়েকবছর ধরে এ ধরনের ব্লুফিল্ম দেখানো চলছে। যৌন বিকারগ্রস্ত পুরুষরাই এই সব পর্নোফিল্ম দেখে থাকে। দু-দিন আগে একটা ব্লু ফিল্মের রিল আমাদের হাতে এসেছে। লোকটা গাড়ির ধাক্কায় মারা যায়। তার অ্যাটার্চির মধ্যে এই রিলটা ছিল। এখন আমরা সেটাই দেখব।

ঘর অন্ধকার।

স্ক্রিনে ফুটে উঠল একটা যুবতী মেয়ের নগ্ন শরীর, বিছানায় শুয়ে, বিশাল এবং নির্লোম দেহের এক পুরুষ তার ওপর চেপেছে। ক্লোজআপ ছবি, মস্ত বড়ো পুরুষাঙ্গটি স্ত্রীর অঙ্গের গোপন গহ্বরে প্রবেশ করেছে। গলায় লাল রিবন বাঁধা মেয়েটার। মেয়েটাকে ম্যাক্স চেনে না বটে, কিন্তু লাল রিবন বাঁধা এই রকম একটি নারীর লাশ সে কোথায় যেন দেখেছিল!

ফিল্ম চলছে–

মেয়েটার চরম পুলকের মুহূর্তে পুরুষের বলিষ্ঠ হাত তার গলা টিপে ধরল। মেয়েটার প্রাণহীন দেহ। ক্লোজআপে দেখানো হয়েছে।

ম্যাক্স এতক্ষণে মনে করতে পারল, জুরিখে নদী থেকে যে মেয়েটির লাশ তোলা হয়েছিল, তার গলাতেও লাল ফিতে বাঁধা ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ শুরু হল। জুরিখ, লন্ডন, রোম, পর্তুগাল, হামবুর্গ, প্যারী–সর্বত্রই এই প্রকৃতির খুনের ঘটনা ঘটেছে।

–ম্যাক্স, রেনে আলমেইদি বলতে থাকে, সব কটি ঘটনায় দেখা গেছে, মেয়েরা যুবতী, মাথায় সোনালি চুল, নগ্ন দেহ, গলায় লাল ফিতে। যৌনসঙ্গমের পর গলা টিপে তাকে হত্যা করা হয়েছে। তার মানে, খুনি একজন যৌনবিকারগ্রস্ত রোগী। পয়সা আছে। পাসপোর্ট দেখিয়ে পৃথিবীর নানা দেশে এই জঘন্য কাজ করে চলেছে।

রেনের সহকারীর কাছ থেকে ম্যাক্স জানতে পারল, ব্রাসেলসের একটা ছোটো কোম্পানি পর্নোফিল্মের স্টক করেছে। কারা এই সব ফিল্ম কিনেছে, তারও লিস্ট তারা পেয়েছে। ম্যাক্স লিস্টটা দেখতে চাইল।

.

২৭.

বার্লিন। নিকসড কম্পিউটার। কিছু জানতে গেলে বিশেষ পাঞ্চ কার্ড প্রায়োজন হয়।

ওয়ালথার গ্যাসনার?

কম্পিউটারের স্ক্রিনে ওয়ালথার গ্যাসনারের অঙ্কের মতো নিখুঁত এবং ফটোর মতো স্বচ্ছ বিবরণ ফুটে উঠল। কোন্ কোন্ হোটেলে যায়, কোন্ মদ পছন্দ করে, কোন্ খাবার ইত্যাদি। সুদর্শন, সুপুরুষ। স্কি খেলার এক্সপার্ট, বয়সে বড়ো এক ধনী মহিলাকে সে বিয়ে করেছে।

একটা চেক। কনসালটেশনের জন্য ডক্টর হেসেনকে দুশো মার্ক দেওয়া হয়েছে। ড্রেসডনার ব্যাঙ্কে ডাক্তারের অ্যাকাউন্ট আছে।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে ফোনে কথা বলল ম্যাক্স।

–ডক্টর হেসেন একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ।

চোখ বুজে একটুক্ষণ বসে রইল ম্যাক্স। হ্যাঁ, সূত্র একটা পাওয়া গেছে।

হ্যালো, ডক্টর হেসেন।

–এখন সময় নেই।

সময় আপনাকে দিতেই হবে। ওয়ালথার গ্যাসনার কেন আপনার কাছে গিয়েছিল বলতে পারেন?

–পেশেন্টের ব্যাপার অন্য কাউকে বলি না।

ম্যাক্স কম্পিউটারকে বলল–ডক্টর হেসেনের ব্যাপারে খবর চাই।

তিন ঘন্টা পরে ম্যাক্স আবার ডক্টর হেসেনকে ফোনে যোগাযোগ করল।

–আমি তো জানিয়েছি, রোগীর গোপন খবর বলতে পারব না। কোর্ট অর্ডার নিয়ে আসতে হবে।

–ডক্টর, আমার সামনে তোমার গত পাঁচ বছরের ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন। তুমি সরকারকে ফাঁকি দিচ্ছো। আয়ের শতকরা পাঁচশো ভাগের সুদ জমা দিচ্ছে না। কথাটা জার্মান ইনকাম ট্যাক্স অফিসারের কানে গেলে কী অবস্থা হবে বুঝতে পারছো। মিউনিখে তোমার সেফ ডিপপাজিট আছে। ওরা যদি খুলে ফেলে

-ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমার নাম বলো।

সুইস ক্রিমিনাল পুলিশের ডিটেকটিভ ম্যাক্স হরনাং।

–বলুন, আপনি কী জানতে চাইছেন?

–আমি ওয়ালথার গ্যাসনারের ব্যাপারে–

ও অ্যাপয়ন্টমেন্ট না করেই এসেছিল। বলল, ওর এক বন্ধু নাকি সিজোফ্রেনিয়ায় ভুগছে, যে-কোনো সময় মানুষ খুন করতে পারে। ওর তাকে পাগলা গারদে দেবার ইচ্ছে নেই। আমি বলেছিলাম, মানসিক রোগীর দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হয়। তবে আমার ধারণা, বন্ধু বান্ধব নয়, ও নিজেই একজন সাইকিয়াট্রিক পেশেন্ট।

না, মিলছে না। ব্যাপারটা কেমন খাপছাড়া লাগছে।

সকালে ম্যাক্স জুরিখে ফিরে এল। টেবিলে ইন্টারপোলের টেলিটাইল। ম্যাক্স দেখল রফিল্ম ক্রেতাদের লিস্ট–আটজন। ওই তালিকায় রফ অ্যান্ড সন্সের নামও আছে।

.

চিফ ইন্সপেক্টর অবাক। আবার বড়ো কেস ম্যাক্সের হাতে এসেছে, বরাত সত্যিই ভালো।

স্যাম রফের মৃত্যু, জীপ অ্যাক্সিডেন্ট, লিফট ভেঙে পড়ে যাওয়া ইত্যাদির জন্য তুমি কাকে সন্দেহ করছ?

চারজন বোর্ড মেম্বারের মধ্যে একজন খুনি।

-সে কে? কে লিজ রফকে হত্যা করতে চাইছে?

–সে লোকটা হল রিস্ উইলিয়ামস। সে স্যাম রফের মৃত্যুর সময় ঘটনাস্থলে ছিল।

.

২৮.

মিসেস রিস্ উইলিয়ামস! এলিজাবেথ রফের যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না এককালে কাগজে সে এই নামটা অনেকবার লিখেছে। আজ তার আঙুলে এনগেজমেন্ট রিং।

রিস্ উইলিয়ামস আর এলিজাবেথ রফ–তারা এখন বোয়িং ৭৩৭-৩২০ বিমানে। অতলান্তিক সমুদ্রের পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট ওপরে ইরানি ক্যাভিয়ার আর ডম পেরিংটন মদ দিয়ে ডিনার সারা হয়েছে।

উল্টোদিকের চেয়ারে বসে আছে রিস্ উইলিয়ামস।

লিজা তাকিয়ে আছে কী সুন্দর, সুপুরুষ!

হাসছো যে?

না, আমি সুখী; তাই...।

সে কত সুখী, তার স্বামী কোনোদিন জানবে না। সে রিকে খোর পর থেকেই তার প্রেমে পড়েছে। তাকে সে ভালোবাসে। সে হতে চায় রিসের বাস, রে মা। কিন্তু রিস্? সে তাকে ভালোবাসবে তো?

ব্যাঙ্কার জুলিয়াসের সঙ্গে মিটিং শেষ হল লিজার।

সে রিসের অফিসে এসে ঢুকল।

রিস, তুমি আমায় বিয়ে করবে? মানে,...তুমি তাহলে রফ অ্যান্ড সন্সের প্রেসিডেন্ট হতে পারবে। ব্যাঙ্ক তাহলে টাকা শোধের জন্য চাপ দেবে না। এই কোম্পানির প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য তোমাকে আমার গলায় মালা দিতে হবে। কোনো পরিবারের অন্যান্য মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। অবশ্য তুমি স্বাধীনভাবে জীবন-যাবন করতে পারবে, ইচ্ছে হলে...

–অবাক হলাম। প্রত্যেক দিন তো সুন্দরী মেয়েদের কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব পাব না।

হ্যাঁ, তুমি হবে কোম্পানির প্রেসিডেন্ট। তবে ব্যাঙ্কের স্টক এবং ভাটাধিকার আমার

দায়িত্বেই থাকবে।

–আমি যদি কোম্পনি চালাই।

হ্যাঁ, তুমি চালাবে। তবে শেয়ারের ব্যাপারটা আমার অধিকারে থাকবে। এটা আমি কাউকে দেব না।

তার মানে? রিস মনে মনে চটে গেল। সে ঠিক করে রেখেছিল, প্রেসিডেন্ট হয়ে শেয়ার বেচার অধিকার সবাইকে দেবে। কিন্তু এখন সে গুড়ে বালি।

তার আগে লিজ রফকে জানতে হবে, শেয়ার বেচায় বাধা পেয়ে কে কোম্পানির ক্ষতি করে চাপ সৃষ্টি করতে চেয়েছে, কে খুন করেছে স্যাম রফকে। লিজ রফকে খুন করার চেষ্টা করছে কে? রিসূকে সে এসব কথা জানায়নি, বলার সময় এলেই বলবে।

জুরিখে এলিজাবেথ রফ ও রিস্ উইলিয়ামসের বিয়ের পার্টি দেওয়া হল। এসেছে অ্যালেক ও ভিভিয়ান, ইভো পালাজজি ও সিমনেত্তা এবং শার্ল ও হেলেন। আসতে পারেনি অ্যানা ও ওয়ালথার–অসুস্থ। বাকি সবাই ওদের শুভেচ্ছা জানিয়েছে।

হেলেন বলল–রিসের সঙ্গে তোমার এত গভীর প্রেম, আগে জানতাম না!

শার্ল মদ খাচ্ছে।

বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে যাওয়া ল্যাবরেটরির বিস্ফোরক প্যারীর অফিস থেকেই তৈরি হয়েছিল।

ইভো হাসছে।

ইতালি থেকে টাকা নিয়ে পালাতে গিয়ে যে ধরা পড়েছিল, তার সম্বন্ধে ইভোই পুলিশের কাছে জানিয়ে দিয়েছিল।

শার্ল? ইভো? অ্যালেক? ওয়ালথার? কে খুনি?

.

বোর্ড মিটিং-এ শার্ল বলল–রিস, তুমি এখন প্রেসিডেন্ট। শেয়ার বেচার পারমিশন পাওয়া যাবে তো?

–স্টক লিজ নিজে দেখছে।

না, শেয়ার বিক্রি করা যাবে না। লিজা জানিয়েছিল।

মিটিং শেষ হলে রিস্ বলল লিজা, চল আমরা রিও থেকে হনিমুন সেরে আসি। ওখানকার অফিসে যাওয়া প্রয়োজন। শুনলাম, ম্যানেজার এই সংস্থায় থাকতে চাইছে না। তা হলে কোম্পানির খুব ক্ষতি হবে। তোমাকে না নিয়ে গেলে সবাই নিন্দা করবে।

-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাব।

রিওতে এখন গ্রীষ্মকাল। প্রিন্সেপ সুগার লোফ হোটেল। চারটে বেডরুম, লিভিংরুম, রান্নাঘর ভাড়া করা হয়েছে। খোলা বারান্দা থেকে সমুদ্র দেখা যায়। রুপোর ফুলদানিতে ফুল, শ্যাম্পেন, হুইস্কি, চকোলেট–সব আছে।

হোটেলটা ভালোই, ম্যানেজার এসে মাঝে মাঝে খোঁজখবর নিয়ে যাচ্ছে।

একটা ফোন পেয়ে রিস্ চলে গেল। পাতলা সিল্কের নাইট গাউন পরে বালিশে চুল ছড়িয়ে দিয়ে লিজা প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে।

কোথায় গিয়েছিল রিস্?..

রিওর বাইরে রফ অ্যান্ড সন্সের ফ্যাক্টরি। সেখানকার প্ল্যান্ট ম্যানেজার সিনর টমাস। মাঝবয়সী। সে আর রফ অ্যান্ড সন্স-এ কাজ করতে চাইছে না। অন্য কোম্পানি তাকে ভালো মাইনে দেবে।

-কিন্তু আমাদের সঙ্গে তোমার যে কনট্রাক্টরিস বলল।

–ও ছিঁড়ে ফেলে দেব। সুখ যদি না থাকল তাহলে ওই কাগজ দিয়ে কী হবে?

–ওরা কি জানে তুমি জেলে যাচ্ছ?

–জেল? কেন?

–বিদেশে ব্যবসা করতে গিয়ে কাকে কাকে ঘুষ দেওয়া হয়েছে, তার তালিকা চেয়ে পাঠিয়েছে ইউনাইটেড স্টেটস সরকার। রবারটো, তুমিও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত। কোম্পানির স্বার্থে আইন অমান্য করেছে। এখানে থাকলে কিছু একটা ভাবা যেত। থাকছে না যখন, গুড বাই।

আমাকে এভাবে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে এখন সরে যাচ্ছো?

তুমিই সরে যাচ্ছো রবারটো।

–বেশ, আমি এখানেই থাকব। তাহলে ব্যাপারটা ফাস হবে না আশা করি?

নিশ্চয়ই না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা।

নাইট ক্লাবে দেখা গেল রিস্ এক সুন্দরী স্পেনিস তনয়ার সঙ্গে নাচছে।

লিজা এগিয়ে এল–মেয়েটাকে সরিয়ে দিল। বলল, এখনও আমার স্বামীর সঙ্গে নাচার সুযোগ হয়নি আমার।

বাজনার মৃদু শব্দ। তালে তালে নাচছে ওরা দুজন। লিজের উরু স্পর্শ করে রিসের পুরুষাঙ্গ। সেটা শক্ত হয়ে উঠেছে।

ওরা হোটলে ফিরে এল। দুজনেই প্রত্যেকটি পোশাক খুলে ফেলল। নগ্নতা, সান্নিধ্য, আলিঙ্গন, চুম্বন। সব কিছু দ্রুত গতিতে ঘটে যাচ্ছে। অনিয়ন্ত্রিত গতি। তারপরেই কামনার, বিস্ফোরণ। নিথর ক্লান্ত দুটি শরীর বিছানায় নেতিয়ে পড়ল।

এলিজাবেথ এখন মিসেস রিস্ উইলিয়ামস। সে সুখী এবং সুখী।

.

২৯.

জুরিখের অফিসে বসে আছে রিস্ ও লিজা। ডিটেকটিভ ম্যাক্স এসে ঢুকল। কোনোরকম ভনিতা না করে বলল–কেউ মিস লিজা রফকে খুন করার চেষ্টা করেছে। একবার নয়দু-বার। বিফল হয়েছে। আবার খুনী আপনাকে আঘাত করার চেষ্টা করবে।

লিজ বলে–আপনার বোধহয় ভুল হচ্ছে। সার্ডিনিয়ার পুলিশ জীপ পরীক্ষা করে দেখেছে।

মাদাম, আপনিই ভুল করছেন। গ্যারাজে যে জীপটা আপনি দেখেছেন, ওটাতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি। অলিবিয়ার ভাঙাচোরা মোটর গাড়ি রাখার একটা জায়গায় অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া গাড়িটা আমি খুঁজে পেয়েছি। ওই গাড়ির মাস্টার সিলিন্ডারের বল্টু আলগা করে দেওয়া হয়েছিল। ব্রেকফুইড পড়ে যাওয়ায় গাড়ির ব্রেক ধরেনি। সামনের বাঁদিকের ফেনডার ভেঙে গেছে।

–এটা কী করে হয়? রিস চমকে উঠল।

–প্রতিটি জীপ দেখতে একই রকম হয়। পাহাড় থেকে জীপ পড়ে গেল। গাছে ধাক্কা খেল। তখনই ওরা আপনাকে খুন করত, যদি না অন্য লোকজন এসে পড়ত। ওরা তখন আপনার জীপটা সরিয়ে একটা সামান্য ভাঙাচোরা জীপ ওখানে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল।

–ওরা কারা? রিসের প্রশ্ন।

–যে স্যাম রফকে খুন করেছিল। গাইড সেজে অন্য নাম নিয়েছিল। আপনার বাবা একা সুইজারল্যান্ডে যাননি। অন্য লোক ছিল।

–সে কে?

–আপনার স্বামী।

–মিথ্যে কথা! পাহাড়ে চড়ার সময় স্যামের সঙ্গে আমি ছিলাম না। রিস্ বলতে থাকে। শোনো লিজা, তোমাকে একটা গোপন খবর বলি। গত কয়েক বছর ধরে কেউ রফ অ্যান্ড সন্সের ক্ষতি করার চেষ্টা চালিয়েছে। স্যাম এ ব্যাপারে একটা রিপোর্ট পেয়েছিল। আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাইল সে। সুইজারল্যান্ডে ডেকে পাঠাল। কিন্তু স্যাম এ ব্যাপারে যাকে সন্দেহ করেছিল, সম্ভবত সে টের পেয়েছিল। তাই স্যামকে মরতে হল। আর রিপোর্টও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

–রিপোর্টটা আমি পড়েছি। রিপোর্ট বলছে, বোর্ডের কোনো সদস্য এই খুনের সঙ্গে জড়িত অথচ দেখো, এই কোম্পানিতে প্রত্যেকের নামে শেয়ার আছে। তাহলে সে কেন কোম্পানির ক্ষতি করতে চাইবে?

-না, মিসেস উইলিয়ামস, ম্যাক্স বোঝাবার চেষ্টা করল, অপরাধী আপনাদের কোম্পানির বিনাশ চায় না। সে এমন একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে চেয়েছে, যখন টাকার জন্য ব্যাঙ্ক আপনাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। বাধ্য হয়ে তখন স্যাম রফ বাইরে শেয়ার

বিক্রির অনুমতি দেবে। কিন্তু সেই অপরাধীর অভীষ্ট এখনও পূরণ হয়নি। তাই আপনার ফাড়া কাটেনি।

.

৩০.

অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে চলেছে ওয়ালথার গ্যাসনার। চার সপ্তাহ ধরে চলছে। ব্যথা। কমাবার ট্যাবলেট সে খায় না, পাছে ঘুমিয়ে পড়ে, যদি অ্যানা তাকে আবার আক্রমণ করে।

ডাক্তার তাকে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। যথেষ্ট রক্তপাত হয়েছে। কিন্তু ওয়ালথার রাজি হয়নি। কোম্পানির ডাক্তার হওয়ায় পুলিশে রিপোর্ট করেনি।

অ্যানা যখন তাকে কাচির ধারালো ফলা দিয়ে আঘাত করল, সে তখন কোনোমতে অ্যানাকে জোর করে বেডরুমে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

অ্যানা চেঁচাচ্ছিল–আমার বাচ্চারা কোথায়?

সেই থেকে অ্যানা শোবার ঘরে বন্দি। খাবার দিয়ে আসে ওয়ালথার, তখন তার চিৎকার শোনা যায়–আমার বাচ্চারা কোথায়?

ঝি মেনডলার কাজ করতে এসেছে। সপ্তাহে একদিন করে আসে ও। বাড়িটা সুনসান। কিছু খুচরো পয়সা আর সোনার পিলবক্স হাতিয়ে নিল সে।

বেডরুমে তালাবন্ধ দেখে সে ভাবল, ভেতরে কিছু আছে নাকি। দরজার হাতল ঘোরাল। ভেতর থেকে একটা নারীকণ্ঠ শোনা গেল–আমাকে বাঁচাও! পুলিশের খবর দাও! এখানে আমাকে আটকে রাখা হয়েছে।

কোথা থেকে ওয়ালথার গ্যাসনার এসে ঝিকে ওখান থেকে সরিয়ে দিল–এখানে তুমি, কী করছ? গেট আউট, তোমাকে আর চাই না, তোমার এজেন্সিকে বলে দেব। চলে যাও।

ঝি দ্রুত পায়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। উপরি হিসাবে খুচরো পয়সা আর সোনার পিলবক্স পেয়ে সে মহাখুশি।

.

জুরিখে পুলিশ ডিটেকটিভ ম্যাক্স হরনাং প্যারীর ইন্টারপোল হেডকোয়াটার্সের রিপোর্টে চোখ দিয়ে বসে আছে। রফ অ্যান্ড সন্স একই স্টক থেকে ব্লু ফিল্ম কিনেছে। জেনারেল এগজিকিউটিভের অ্যাকাউন্টে কেনা হয়েছে। যে এজেন্ট কিনেছে সে এখন ওই কোম্পানির এজেন্ট নয়। খোঁজখবর চলছে।

.

৩১.

রিসের প্রাইভেট ফোন বেজে উঠল।

–হ্যালো নারীকণ্ঠ। হেলেন রফ মারতেইল বলছি। রিস, তুমি কি এর মধ্যেই লিজার পোষা হয়ে গেছো? বিকেলে আসছো তো? নয়তো আমাকেই জুরিখে যেতে হয়।

-না-না, তোমাকে আসতে হবে না। আমিই যাব।

–গুড, আমদের পুরোনো জায়গায়

এই মহিলার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত যৌন মিলনের অভিজ্ঞতা রিসের আছে। মেয়েটা কামনা জাগাতে পারে। হেলেন রফ মারতেইল তার স্বামী শার্লকে পছন্দ করে না। রিকে সে কাছে পেতে চায়।

রিস এলিজাবেথের অফিসে এসে ঢুকল।

লিজা ফিসফিস করে বলল–চলো রিস, আমরা বাড়ি যাই। তারপর বিছানায় শুয়ে

–তোমায় যৌন ক্ষুধায় ধরেছে দেখছি। আমাকে বিকেলে প্যারীতে যেতে হবে।

–আমিও যাব।

দরকার নেই। ছোট্ট কাজ। রাতেই ফিরে আসব।

.

লেফট ব্যাঙ্কের ছোট্ট হোটেলের ডাইনিং রুম। হেলেন রফ মারতেইল বসে আছে। সে সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী। দেহ নিয়ে বিচিত্র খেলা খেলতে পারে। কিন্তু তার খেলার মধ্যে আছে নিষ্ঠুরতা, আততায়ীর মতো। সে করুণা করতে জানে না।

–ডার্লিং, তোমায় বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। বলল, কেমন লাগছে বিয়েটা? বিছানার ব্যাপারে লিজা নিশ্চয়ই খুব যত্নশীল।

হেলেনের আঙুল খেলা করছে রিসের হাতের ওপর। রিস্ জানে, বিছানায় হেলেন নেকড়ে বাঘের মতো হয়ে যায়। বন্য, চতুর ও কুশলী, প্রবল যৌন আকাঙ্ক্ষা। সহজে তৃপ্ত হয় না।

রিস্ তার হাত সরিয়ে নিল। হেলেনের দৃষ্টিতে শীতলতা।

রফ অ্যান্ড সন্সের প্রেসিডেন্টের চেয়ারে কেমন লাগছে রিস?

ওহো, রিস তো হেলেনের উচ্চাশার কথা ভুলেই গিয়েছিল! হেলেন বলেছিল, স্যাম সরে গেলে আমরা দুজনে মিলে কোম্পানি চালাতে পারি।

ক্ষমতার লোভে হেলেনের যৌনকামনা বাড়তে থাকে এবং তা বিপজ্জনক।

–বলল, আমায় ডেকেছ কেন?

–রিস, ভুলে যেও না, তুমিও উচ্চাশা পোষণ করো, আমারই মতো। না হলে স্যামের পাশে পাশে ছায়ার মতো এই কোম্পানিতে পড়ে ছিলে কেন? কারণ তোমার উচ্চাশা ছিল, একদিন রফ অ্যান্ড সন্সের সর্বেসর্বা হবে।

-স্যামকে আমি পছন্দ করতাম। তাই ওর সঙ্গে থাকতাম।

–তাই নাকি! এখন স্যামের সুন্দরী মেয়ে তোমার ঘরনী হয়েছে।

প্লাটিনামের লাইটারের আগুনে পাতলা কালো চুরুট ধরাল হেলেন। বলল, শার্লের কাছে। শুনলাম, এলিজাবেথ শেয়ার বিক্রিতে বাধা দিচ্ছে?

–হ্যাঁ, তাই।

–আচ্ছা রিস, ভেবে দেখো তো, লিজার অ্যাক্সিডেন্ট হল, সে মারা গেল, তারপর তারপর তোমার হাতে এল অতুল সম্পদ।

রিস্ ওর দিকে অপলক তাকিয়ে রইল।

.

৩২.

ওলগিয়াতা। বাড়ির জানালা দিয়ে ইভা পালাজজি বিশ্রী একটা দৃশ্য দেখতে পেল।

দোনাতেল্লা, সঙ্গে তিন ছেলে। ড্রাইভওয়ে ধরে এগিয়ে আসছে। সিমনেত্তা ওপরের ঘরে ঘুমোচ্ছ। ইভোর ভাগ্য ভালো। সে দ্রুত পায়ে বাইরে বেরিয়ে এল–দোনাতেল্লার সঙ্গে সে সর্বদা সুন্দর ব্যবহার করেছে। অথচ সেই দোনাতেল্লা তার : জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। সংসার ভাঙতে চাইছে।

ছেলেরা বাবাকে কাছে পেয়ে জড়িয়ে ধরল। চুমু খেল।

তোমার বউ কোথায়? ওর সঙ্গে দেখা করব। ছেলেরা, এসো।

ইভো এখন একেবারে কুঁকড়ে গেছে। ভালোমানুষ বলে নিজের প্রতি আস্থা আছে তার। অনেক কষ্ট করে সে জীবনে উন্নতি করেছে। সামান্য ভুলে সে ওসব হারাতে চায় না। কিন্তু এজন্য তার অপছন্দের একটা কাজ করতে হবে।

ইভো বলল–আর পাঁচটা দিন সময় চাইছি। কথা দিচ্ছি। টাকা তোমাকে দেব।

.

হাউস অফ কমন্সে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক চলেছে। রক্ষণশীল দলের মতে, শ্রমিকদের ধর্মঘট দেশের অর্থনৈতিক ধ্বংসের কারণ। শ্রমিকশ্রেণীর ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নিতে হবে। কিন্তু কীভাবে? তাই নিয়েই চলেছে বিতর্ক, কথাবার্তা।

স্যার অ্যালেক নিকলস বক্তৃতা মঞ্চে উঠে দাঁড়াল-শ্রমিকরাই দেশের বন্ধু। দেশকে মহান করে তুলেছে। ওরা মিল চালায়, ফ্যাক্টরির চাকা ঘোরায়। ওরা দেশের মেরুদণ্ড। কিন্তু

জাতীয় জীবনে কখনও কখনও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। শ্রমিকদের প্রয়োজনে ত্যাগের পথে চলতে হবে।

বক্তৃতা শেষ হল। পেছনে কারা যেন হাততালি দিয়ে উঠল। এমন সময় এক কর্মচারী এসে বলল–স্যার অ্যালেক, তাড়াতাড়ি বাড়িতে যান। দুর্ঘটনা

অ্যালেক বাড়ি ফিরে এল। দেখল অচৈতন্য ভিভিয়ানকে অ্যাম্বুলেন্সে ভোলা হচ্ছে।

কী হয়েছে ডক্টর?

জানি না। একটা উড়ো ফোন পেয়ে এখানে এসে দেখি লেডি নিকলস বেডরুমের মেঝেতে পড়ে আছেন। তার হাঁটু দুটো পেরেক দিয়ে মাটির সাথে আটকে দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখছি। তবে একটা কথা, উনি আর মাটিতে পা ফেলে জীবনে হাঁটতে পারবেন না।

অ্যাম্বুলেন্সে চড়ে অ্যালেকও হাসপাতালে এল।

ভিভিয়ানের জ্ঞান ফিরে এল। সে জানাল, দুটো লোক, মুখোশে মুখ ঢাকা, তার পা দুটো ভেঙে দিয়েছে।

ভিভিয়ান মুখ ভার করে বলল–আমি আর হাঁটতে পারব না, নাচতে পারব না। অ্যালেক, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না তো।

নৈরাশ্য ও যন্ত্রণায় অ্যালেকের চোখ ফেটে জল এল। বিপদের মধ্যেও তার হৃদয়ে খুশির ঝিলিক খেলে গেল। ভিভিয়ান আর অন্য পুরুষের সংসর্গ কামনা করবে না। সে স্বামীর কাছেই থাকবে। সে তার পঙ্গু স্ত্রীর যত্ন নিতে পারবে।

.

৩৩.

জুরিখ। ৪ঠা ডিসেম্বর। বৃহস্পতিবার।

জুরিখের ক্রিমিন্যাল পুলিশের হেডঅফিসে একটা ফোন এল।

চিফ ইন্সপেক্টর ডিটেকটিভ ম্যাক্স হরনাংকে বলল–রফ কেসের সমস্যা সমাধান হয়ে । গেছে। অপরাধীর সন্ধান মিলেছে। তুমি এখনই বার্লিন এয়ারপোর্টে চলে যাও।

ম্যাক্স চলে গেল।

চিফ ইন্সপেক্টর ফোন তুলে দিলেন–হ্যালো মিসেস এলিজাবেথ রফ উইলিয়ামস, ভালো খবর আছে। আপনি এখন বডিগার্ড ছাড়াই চলাফেরা করতে পারবেন খুনীর সন্ধান মিলেছে।

–খুনি কে?

–ওয়ালথার গ্যাসনার।

.

পুলিশ বাড়িটা ঘিরে ফেলল।

পুলিশের গাড়ির সামনের সিটে দুজন ডিটেকটিভ, পেছনের সিটে মেজর ওয়েলম্যান ও ডিটেকটিভ ম্যাক্স।

–আমাদের সাবধানে এগোতে হবে। মেজর বলল। ওয়ালথার ওর বউকে আটকে রেখেছে।

–আর ওয়ালথার?

–তোমার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তোমাকে তাই ডেকেছি।

কী ভাবে?

–তুমিই আমাদের জানিয়েছিলে ওয়ালথার এক মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়েছিল। অন্যান্য মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের কাছে ওর চেহারার বর্ণনা দেওয়া হল। ওরা বলল, ও আরও দুজন ডাক্তারের কাছে যায়, ছদ্মবেশে। মানসিক রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে খোঁজ নেয়। ও যে একজন মনোবরাগী, তা ও জানত। ইতিমধ্যে ওর বউ পুলিশে ফোন করে সাহায্য চেয়েছিল। পুলিশ গিয়েছিল। অ্যানা বলেছিল, না, কিছু হয়নি। আজ সকালে ওদের ঝি ফোন করেছিল। বলল, ওয়ালথার গ্যাসনার নাকি ওর বউ অ্যানাকে ঘরে

তালাবন্ধ করে ফেলে রেখেছে। তাদের বাচ্চাদের খুন করেছে। অ্যানা সোমবার ওই ঝিকে বলেছিল, তার স্বামী তাকে খুন করতে পারে।

সোমবার! এত দেরি করে মেয়েটা

–মেয়েটা কোনো ঝুট ঝামেলায় যেতে চাইছিল না। শেষ পর্যন্ত ওর পুরুষবন্ধু ওকে বোঝায়, ও তাই আজ সকালে ফোন করেছে।

গ্যাসনার এস্টেটের প্রবেশ পথ থেকে কিছুটা দূরে পুলিশের গাড়ি দাঁড়াল।

ডিটেকটিভ দুজন গাড়ি থেকে নেমে এল। বলল–মেজর, লোকটা বাড়ির ভেতরেই আছে। জানালা বন্ধ।

পুলিশ তখন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। বর্ম পরে টেলিস্কোপ রইফেল আর টিয়ার গ্যাস নিয়ে তৈরি।

ছক অনুযায়ী কাজ শুরু হল।

মেজরের ইঙ্গিতে নীচের এবং ওপরের ঘরগুলোয় জানালায় টিয়ার গ্যাস গ্রেনেড ছোঁড়া হল। সামনের ও পেছনের দরজা ভাঙা হল।

ম্যাক্স ও মেজর ভেতরে ঢুকল। দুজন পুলিশ ডিটেকটিভ হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল ওয়ালথার গ্যাসনারের। পরনে ওর ঢিলে রাতপোশাক ও পায়জামা। কয়েক দিন দাড়ি কামানো হয়নি। মুখ শুকনো, চোখ ফোলা।

ওয়ালথার গ্যাসনারকে দেখে ম্যাক্স অবাক হল। কম্পিউটার যে ওয়ালথার গ্যাসনারের কথা বলেছিল, তার সঙ্গে এর মিল নেই। এ যেন মনে হয় নকল ওয়ালথার গ্যাসনার!

মেজর বলল–হের গ্যাসনার, আপনাকে আমরা গ্রেপ্তার করছি। আপনার স্ত্রী কোথায়?

–ও চলে গেছে। আমি

সেই মুহূর্তে ওপরের ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল এক পুলিশ ডিটেকটিভ–পাওয়া গেছে! মিসেস অ্যানা গ্যাসনারকে পাওয়া গেছে! তালাবন্ধ ঘর থেকে তাকে পাওয়া গেছে।

কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল অ্যানা গ্যাসনার। শনের মতো চুল, মুখে সাদা দাগ। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর বলছে, ও আমার বাচ্চাদের মেরে ফেলেছে।

ওয়ালথার অসহায় দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আছে। তাকে প্রাণহীন মনে হল।

অ্যানা চেঁচিয়ে বলল–আমার বাচ্চাদের তুমি মেরে ফেলেছ?

–ও কি ঠিক বলছে? মেজর ওয়ালথারকে প্রশ্ন করল।

ওয়ালথার ঘাড় নাড়ল–হ্যাঁ। এক নিমেষে সে যেন অনেক বুড়ো হয়ে গেছে। পরাজয়ের ছায়া চোখের পাতায়। হ্যাঁ, ওরা আর বেঁচে নেই।

–ডেডবডি দুটো আমরা দেখতে চাই।

ওয়ালথারের গাল বেয়ে চোখের জল নেমে এল।

–কোথায় তাদের লাশ রেখেছ? মেজর ওয়েডম্যান আবার জানতে চাইল।

–ওরা সেন্ট পলস গির্জার কবরখানায় শুয়ে আছে। ডিটেকটিভ ম্যাক্স হরনাং এবার জবাব দিল, জন্ম মুহূর্তেই তাদের খুন করা হয়। পাঁচ বছর আগে।

.

৩৪.

জুরিখ। ৪ঠা ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার। রাত ৮টা।

হিমেল রাত। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। তুষার উড়ছে হাওয়ায়। পাউডারের মতো। চারপাশ অন্ধকার। কেবল রফ অ্যান্ড সন্সের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর আলোগুলো ম্লান হয়ে জ্বলছে।

রাত বাড়ছে। এলিজাবেথ অফিসে কাজ করছে। আর ভাবছে, জেনেভার মিটিং সেরে কখন তার স্বামী রিস্ উইলিয়ামস ফিরে আসবে। বিল্ডিং ফাঁকা। ওর মন চঞ্চল, কাজে মন দিতে পারছে না। মনে পড়ে যাচ্ছে ওয়ালথার গ্যাসনার আর অ্যানা রফ গ্যাসনারের কথা। লিজা প্রথম যখন ওয়ালথারকে দেখেছিল, সে ছিল সুন্দর সুদর্শন এক যুবক। পাগলের মতো বউকে ভালোবাসত। ভালোবাসত, নাকি ভনিতা করত! বিশ্বাসই হয় না। ওয়ালথার এমন ভয়ংকর নীচ জঘন্য কাজ করতে পারে। অ্যানার কথা ভেবে তার কষ্ট

হয়। কিছুতেই ফোনে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। ইচ্ছে হয়, এখুনি বার্লিনে ছুটে যায়।

ফোন বেজে উঠল। স্যার অ্যালেকের ফোন। লিজা খুশি।

-শুনলে ওয়ালথারের কাণ্ডকারখানার কথা?

–হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।

–ঠিক বলেছ। ওয়ালথার নির্দোষ। ও নিরাপরাধ।

কিন্তু পুলিশ ওকে

–ওরা ভুল করেছে। স্যাম আর আমি আগেই ওয়ালথারের ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছিলাম। যাকে আমরা খুঁজছি সে ওয়ালথার নয়।

–তার মানে? তোমরা কাকে খুঁজছিলে? লিজা ঘাবড়ে যায়।

–এত কথা ফোনে...তাছাড়া তোমাকে একা পাওয়া যায় না। তাই বলা হয়নি।

..গত কয়েক বছর ধরে এমন এক ব্যক্তি কোম্পানির ক্ষতি করতে চাইছে, যে এর সঙ্গে যুক্ত। দক্ষিণ আমেরিকার ফ্যাক্টরিতে বিস্ফোরণ ঘটেছে, পেটেন্ট চুরি হয়েছে। ভুল লেবেল বিষাক্ত ওষুধের শিশির গায়ে সাঁটা হয়েছে। আমি স্যামকে বলেছিলাম, একজন প্রাইভেট

গোয়েন্দার ওপর এই কাজের দায়িত্ব দিতে। ব্যাপারটা নিয়ে আমরা আর কানাকানি করিনি।

এলিজাবেথের মনে হল, তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বুঝি বন্ধ হয়ে যাবে। অ্যালেকের কণ্ঠস্বর ফোনে, কিন্তু মনে হচ্ছে তার স্বামী রিস্ উইলিয়ামস কথা বলছে।

অ্যালেক বলে চলেছে বাইরের এক ডিটেকটিভের হাতে অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ওরা রিপোর্ট দিয়েছিল। সেই রিপোর্ট নিয়ে স্যাম সুইজারল্যান্ডে গিয়েছিল। স্যাম ফোনে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল।

–অ্যালেক, তুমি আর আমার বাবা ছাড়া এই গোপন রিপোর্টের কথা আর কেউ। জানতো কী?

না, তবে স্যামের ধারণা, কোম্পানির টপমহলের কেউ এসবের সঙ্গে যুক্ত?

টপ মহলের কেউ...

–আচ্ছা, আমার বাবা রিসকে কি এব্যাপারে কিছু বলেছিল? টেনে টেনে কথা বলছে। লিজা।

না, কেন একথা বলছ?

তাহলে? তাহলে কী করে রিস্ এই রিপোর্টের কথা জানতে পেরেছিল? নিশ্চয়ই ও ওটা চুরি করেছিল। একটা মাত্র কারণেই রিস শ্যামনিজে গিয়েছিল। তার বাবাকে সে হত্যা করতে চেয়েছিল।

ফোন রেখে দিল লিজা। আতঙ্ক তাকে ঘিরে ধরেছে। মাথা ঘুরছে, কে যেন তার কানে কানে বলল তোমার স্বামী রিস্ উইলিয়ামস্ খুনি। হ্যাঁ, সে খুন করেছে। খুনি সে!

মনে পড়ে গেল জীপ অ্যাকসিডেন্ট হওয়ার আগের মুহূর্তগুলো। সে রিকে জানিয়েছিল, সার্ডিনিয়াতে যাচ্ছে সে।

আবার লিফট ক্রাশের ব্যাপারটা। মিটিং-এ রিস্ এল না। পরে এল। যখন মিস আরলিং আর সে ছাড়া অফিসে কেউ নেই। আবার খানিকবাদে চলে গেল। ওকি সত্যিই চলে গিয়েছিল? আর যাওয়ার আগে লিফটকে বিকল করে দিয়ে গিয়েছিল।

শরীর কাঁপছে লিজার। মনের মধ্যে চলেছে চাপানউতোর। রিস্ নয়, রিস খুনি হতে পারে না। সে টলমল পায়ে রিসের অফিসে ঢুকল। রিস্ যে নির্দোষ, সেই প্রমাণই সে খুঁজতে এসেছে।

.

আলো জ্বলে উঠল।

ডেস্কের-ওপরে এনগেজমেন্ট বুক। সেপ্টেম্বরে জীপ অ্যাকসিডেন্ট হওয়ার সময় রিস নাকি নাইরোবিতে গিয়েছিল। কথাটা কি সত্যি? পাসপোর্ট দেখলেই জানা যাবে।

কিন্তু ডেস্কের নীচের ড্রয়ার তালা দেওয়া। তালা ভাঙবে? বিশ্বাসভঙ্গ করবে নিজের স্বামীর সঙ্গে? আর কি ফিরে পাবে সেই বিশ্বাস?

না, আর নয়। চিঠি খোলার ধাতবদণ্ড দিয়ে সে তালা ভেঙে ফেলল। ড্রয়ার টানল। একটা খাম রিস্ উইলিয়ামসের নামে। একটা মেয়েলি হাতে লেখা চিঠি। লিখেছে হেলেন রফ মারতেইল। লিখেছে?

ডার্লিং, ফোনে তোমার সাথে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করছি। আমাদের প্ল্যানগুলোর কথা মনে আছে তো। ওগুলোকে ঠিকঠাকভাবে করতে হবে। এজন্য আমাদের আবার দেখা হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

চিঠিটা আর পড়ল না এলিজাবেথ রফ। এবার সেই চুরি করা গোপন রিপোর্ট। বিস্ফারিত চোখে সে দেখছে।

বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা–মিস্টার স্যাম রফ–একান্ত গোপনীয়। কোনো কপি নেই।

মাথা ঘুরছে, চোখ বন্ধ হয়ে আসছে লিজার। কল্পনায় খুনির মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। খুনি–তার স্বামী!

এমন সময় ফোন বেজে উঠল। আওয়াজ লক্ষ্য করে কোনোরকমে নিজের চেম্বারে এসে ঢুকল। ফোন তুলল।

–মিসেস উইলিয়ামস, লবির অ্যাটেনড্যান্টের খুশি-খুশি গলা। আপনি অফিসে আছেন । কিনা, তাই জানতে ফোন করলাম। মিস্টার উইলিয়ামস এখুনি ফিরে আসছেন।

কেন? আবার একটা খুনের মহড়া দেবে নাকি?

লিজের অবর্তমানে রফ অ্যান্ড সন্সের একমাত্র অধীশ্বর হবে রিস্ উইলিয়ামস।

লিজাকে এখনই এখান থেকে পালাতে হবে। তার মুখ দেখলেই রিস্ বুঝতে পেরে যাবে। সে কি অভিনয় করবে? কিছুই হয়নি এমন ভান করবে? না-না, তা সম্ভব নয়।

সে পারবে না। তাকে পালাতেই হবে। কিন্তু কোথায়? যেখান থেকে রিস্ তাকে খুঁজে । পাবে না।

অন্ধ আতঙ্কে লিজা তখন হিস্টিরিয়া রোগীর মতো হয়ে গেছে। দ্রুত হাতে পার্স আর কোটটা তুলে নিল, পাসপোর্টটাও নিতে ভুলল না।

প্রাইভেট লিফটের সামনে এসে দাঁড়াল লিজ। ইনডিকেটারের দিকে তাকাল–লিফট উঠে আসছে–আটতলা নয়-তলা দশতলা–

এলিজাবেথ রফ উইলিয়ামস প্রাণের ভয়ে দ্রুত সিঁড়ির পথ ধরল।

.

৩৫.

সিভিটাভেশিয়া আর সার্ডিনিয়ার মাঝে খাঁড়ি। ফেরিবোটে করে খাঁড়ি পার হতে হয়। শুধু মানুষ নয়, মোটর গাড়িও ভোলা হয় বোটে।, লিজা ভাড়া করা একটা গাড়িতে এসেছে। প্লেনে ওঠেনি। তাহলে রেকর্ড থাকত। বোটে ওসবের বালাই নেই। সার্ডিনিয়ায় অনেকেই ছুটি কাটাতে যাচ্ছে।

সে জানে, কেউ তাকে অনুসরণ করেনি। তবুও আতঙ্কিত মন ভরসা পাচ্ছে না। রিস, উইলিয়ামস সব কিছু করতে পারে। লিজাকে হাতে পেলে, সে আর স্ত্রীকে বাঁচিয়ে রাখবে না। কারণ স্যাম রফের খুনের একমাত্র সাক্ষী ওই লিজা।

ছোটা একটা ভাড়া করা গাড়িতে চড়ে ইতালীগামী অটোরুটে গাড়ি থামিয়ে বুথ থেকে সে অ্যালেককে ফোন করল। পাওয়া গেল না।

–ঠিক আছে, অ্যালেককে জানিয়ে দেবেন, আমি সার্ডিনিয়াতে যাচ্ছি।

এবার ডিটেকটিভ ম্যাক্স। সেও নেই।

-ঠিক আছে, ম্যাক্স এলে তাকে বলে দেবেন আমি সার্ডিনিয়ার যাচ্ছি।

সার্ডিনিয়া ভিলায় সে একা থাকবে। অবশ্য, পুলিশ তার পাহারায় থাকবে, সে জানে।

ফেরিঘোট ওলবিয়ায় এসে ভিড়ল। সেখানে পুলিশ ডিটেকটিভ ব্রুনো ক্যামপানা লিজার জন্যই অপেক্ষা করছিল।

ব্রুনো বলল–আপনি না আসা পর্যন্ত আমরা খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। সুইস পুলিশ জানিয়েছে, আপনি আসতে পারেন। তাই প্লেন ও ফেরিবোটের ওপর আমরা নজর রেখেছিলাম।

লিজা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ওই বুদ্ধিমান বিচক্ষণ পুলিশ ডিটেকটিভ ম্যাক্স হরনাং এর। তাহলে সে খবর পেয়েছে।

ড্রাইভারের আসনে বসল ডিটেকটিভ ব্রুনো। পাশে লিজা।

ওলবিয়ার আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা ধরে গাড়ি কস্টা স্পেরালদার দিকে ছুটছিল। লিজা তাকাল বাইরের দিকে, রিসের স্মৃতি জড়িয়ে আছে এখানকার প্রতিটি জায়গার সাথে।

আমার স্বামীর কোনো খবর?

–ও এখন প্রাণ নিয়ে ছুটছে। তবে বেশি দূর যেতে পারবে না। হয়তো কাল সকালের মধ্যেই ওকে অ্যারেস্ট করা হবে।

এ খবর এলিজাবেথকে যন্ত্রণাদগ্ধ করে তুলল। রিসূ, রিসূকে ও ভালোবাসে। তার স্বামী রিস্ এখন পালাচ্ছে। তার পেছনে এখন ধাওয়া করেছে মানুষ শিকারীরা। পলাতক পশুর মতো রিস্ এখন প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত!

ব্রুনো বলল–কী ভাবছেন? সিরোক্কো বইবে। আমরাও ওই ভেবে ভয় পাচ্ছি, আজ রাতে আমরা সবাই ব্যস্ত থাকব।

সিরোক্কোর মরু বাতাসের ঝড় এলে মানুষ ও পশু পাগল হয়ে যায়। এই সময় অপরাধের ঘটনা বেড়ে যায়। এইসব ক্ষেত্রে বিচারকরা অপরাধীর শাস্তি কিছুটা লাঘব করেন।

গাড়ি এসে থামল। অন্ধকার ভিলা।

ডিটেকটিভ ব্রুনো বলল–মিসেস উইলিয়ামস। এক হাতে তার পিস্তল, অন্য হাতে চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলছে। ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালল। বিপদের ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। বলা যায় না, শত্রু এখানে আগে থেকেই ঘাপটি মেরে বসে আছে। দাঁড়ান, আগে বাড়িটা ভালো করে দেখে নিই।

এক-একটা ঘরে ঢুকে আলো জ্বালিয়ে দেখল বুনো। ক্লোজেট, আনাচে-কানাচে সর্বত্র। এমনকি জানালা দরজা বন্ধ কিনা তাও দেখে নিল। না, কেউ নেই।

নীচের তলায় ফিরে এল ডিটেকটিভ ব্রুনো–হেড অফিসে একটা ফোন করতে হবে। যদি কিছু মনে না করেন।

লিজা তাকে পড়ার ঘরে নিয়ে এল। ডিটেকটিভ ব্রুনো ফোন করল–ডিটেকটিভ ব্রুনো ক্যামপানা বলছি। আমরা এখন ভিলায়। ড্রাইভওয়েতে গাড়ি বদলাও।

চেয়ারে বসে আছে এলিজাবেথ। অজানা আতঙ্কে স্নায়ু টানটান। সে জানে, কাল সকালে সে নিজেকে আর শান্ত রাখতে পারবে না। খবর পাবে, রিসূকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, নতুবা গুলি করা হয়েছে। রিস্ সম্পর্কে তার মনে এখনও আস্থা আছে-রিস্ এসব করতে পারে না।

মিসেস উইলিয়ামস, ডিটেকটিভ ব্রুনো বলল, আমার বউ বলে, আমি খুব ভালো কফি তৈরি করতে পারি। আপনি বসুন, আমি কফি নিয়ে আসি।

ডিটেকটিভ ব্রুনো চলে যেতেই তাকে চিন্তারা এসে গ্রাস করল। অ্যালেকের কাছে যখন সে ফোন করেছিল, তখনও তার ধারণা ছিল, রিস্ নিরাপরাধ। রিস্ একাজ করতে পারে না। নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হয়েছে। লিজের বাবাকে খুন করে তার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে, আবার তাকে খুন করা, কোনো মানুষের পক্ষে... না-না, এ অসম্ভব।

ওহ যিশু, আর ভাবতে পারছি না!

কিন্তু না ভেবেও উপায় নেই। হয়তো পনেরো বছরের মেয়ে লিজাকে দেখার পর থেকেই রিস্ উইলিয়ামস রফ অ্যান্ড সন্সের সর্বেসর্বা হবার দুঃস্বপ্ন দেখে আসছিল হয়তো। তাই ঠিক করেছিল, স্যাম রফকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে বোকা মেয়েটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে নেবে। অবশ্য রিসের প্রতি লিজই প্রথম প্রেম নিবেদন করেছিল। এটাই পরিতাপের বিষয়। হয়তো হেলেন রফ মারতেইল আর রিস্ উইলিয়ামসের মধ্যে অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক থাকায় ওরা দুজনে মিলে ছকটা করেছিল।

ডিটেকটিভ ব্রুনো ক্যামপানা কফির কাপ এগিয়ে দিল–মিসেস উইলিয়ামস, কফিটা খান, ভালো লাগবে।

কফিতে চুমুক দিয়ে কেমন বিস্বাদ লাগল লিজার। সে ডিটেকটিভের দিকে তাকাল।

–এটু স্কচ মিশিয়ে দিয়েছি। ক্লান্তি দূর হবে। তারপর ডিটেকটিভ বলল–পেট্রল কার এল বলে। দুজন পুলিশ সারারাত বাড়িটা পাহারা দেবে। আমি নীচের তলার ঘরে থাকব। আপনি বেডরুমে চলে যান। ঘুমিয়ে নিন। তাজা লাগবে শরীর।

লিজের শরীরে এখন এক বিশ্রী অবসাদ। সে আর বসে থাকতে পারল না। বিছানায় শুয়ে পড়ল। আসলে ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ করার চেষ্টা করছিল।

তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে লিজের সামনে সেই দৃশ্যটা ভেসে উঠল–অন্ধকার রাস্তা। পুলিশের গুলি। রিস মরতে বসেছে।

তাড়াতাড়ি চোখ খুলল। কেঁপে উঠছে শরীর। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। সে জেগে থাকার চেষ্টা করল। কিন্তু চোখের পাতার গুরুভার সে বইতে পারল না, কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমের অতলে হারিয়ে গেল।

.

৩৬.

একটা অদ্ভুত আর্তনাদে ঘুম ভেঙে গেল লিজার।

সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। অদ্ভুত তীব্র আর্তনাদের শব্দ শোনা যাচ্ছে। জানালার বাইরে থেকে শব্দটা ভেসে আসছে।

সে টলতে টলতে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। আঃ, কী চমৎকার উঁদনি রাত। যেন শিল্পী দামিয়েরের আঁকা ছবি। শীতের হাওয়া বইছে। কালো ন্যাড়া গাছগুলোর পাতায় ঝোড়ো হাওয়ার দাপট। দূরে এবং নীচে সমুদ্র, যেন তপ্ত কড়াইতে রাখা জল, ফুটছে।

আর্তনাদ–আবার–আবার।

আসল ব্যাপারটা এলিজাবেথ বুঝতে পারল। সাহারা মরুভূমি থেকে গরম মরু বাতাস তীব্র গতিতে পাথরের ফাঁকের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তার ফলেই সৃষ্টি হচ্ছে ওই শব্দ। যেন পাথর দুঃখের গান গাইছে, বিলাপ করছে। অথচ-অথচ তার কল্পনায় ভেসে উঠল–তার স্বামী রিস্ বুঝি হাহাকার করছে। সে কাঁদছে, সে সাহায্য প্রার্থনা করছে। শব্দটা সহ্য করতে পারল না লিজা। দু হাতে কান চাপা দিল। জানালার কাছ থেকে সরে এল। তবু সে শুনতে পাচ্ছে সেই বিলাপ ধ্বনি।

লিজ টলছে। দুর্বল লাগছে। বেডরুম থেকে বেরিয়ে এল–জোরে ডাকল, ডিটেকটিভ ক্যামপনা।

সাড়া নেই।

এ ঘর থেকে ও ঘর–আসবাবপত্রে হাত রেখে রেখে মাতালের মতো সে পা ফেলছে।

নিশ্চয়ই বাইরে পুলিশ পেট্রলকারের পুলিশদের সঙ্গে গল্পে মেতে আছে ব্রুনো। না, কেউ নেই। কেবল নিঃসীম অন্ধকার, আর হাওয়ার গর্জন।

সে ভাবল, থানায় ফোন করি? কী হয়েছে জানতে হবে।

না, ডায়াল টোন নেই, কানেকশান ছিন্ন। ঠিক তখনই বাড়ির সবকটা আলো নিভে গেল।

.

৩৭.

লন্ডন।

ওয়েস্ট মিনিস্টার হসপিটাল। এখানেই মিসেস ভিভিয়ান নিকলসের হাঁটুর অপারেশন করা হয়েছে। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে তার জ্ঞান ফিরে এল। আট ঘণ্টা ধরে অপারেশন চলেছে। কিন্তু ডাক্তাররা সম্পূর্ণ সফল হতে পারেনি। ভিভিয়ান কোনো দিন দুপায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে পারবে না। সে এখন অ্যালেককে খুঁজছে। তাকে তার খুব প্রয়োজন। বিড়বিড় করে বলল, অ্যালেক তুমি কোথায়? একবার আমার পাশে বসো, বলো, আগের মতো তুমি আমাকে ভালোবাসবে কিনা?

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ স্যার অ্যালেক নিকলসের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করল, কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না।

.

জুরিখ। ক্রিমিনাল পুলিশ দপ্তরে ইন্টারপোল রিপোর্ট পাঠিয়েছে

যে র' ফিল্ম স্টক থেকে ব্লুফিল্ম তৈরি করা হয়েছে, রফ অ্যান্ড সন্সের একজন প্রাক্তন এজেন্ট সেই স্টক থেকেই র ফিল্ম কিনেছিল। করোনারি থ্রম্বসিসে তিন দিন আগে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে তার মৃত্যু হয়েছে। তাই ফিল্ম কেনার ব্যাপারে আর কোনো খবর জানা যাবে না।

.

বার্লিন।

শহরের একটি সুন্দর মফঃস্বল অঞ্চল। ওয়ালথার গ্যাসনার একটি প্রাইভেট স্যানাটোরিয়ামের ওয়েটিং রুমে বসে আছে। বসে বসে দশ ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছে সে এখানে। তার স্ত্রী অ্যানা ভর্তি আছে। মনোররাগের চিকিৎসা হচ্ছে তার।

ওয়ালথারকে কিছু খাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কিন্তু সে কারো কথা কানে নিচ্ছে না। সে তার অ্যানা, তার ভালোবাসার প্রতীক্ষায় বসে আছে। তার জন্য সে অনন্ত প্রহর অপেক্ষা করতে পারে।

.

ইতালি। ওলজিয়াটায় সিমনো ফোন ধরল। মহিলাকণ্ঠ শোনা গেল।

মিসেস পালাজজি, আমি দোনাতো স্পোলিনি। অবশ্য আমাদের আগে কখনও দেখা হয়নি। আমাদের দুজনের অনেক মিল। আসুন না, কাল পিয়াজা দেল পোপোলোতে। বেলা একটায়। দুজনে বসে লাঞ্চ করা যাবে।

–তোমায় তো চিনি না, কী করে চিনব?

–আমার তিন ছেলে আমার সঙ্গে থাকবে।

.

ফ্রান্স।

লা ভেসিনেৎ-এর ভিলা।

হেলেন রফ মারতেইল চিঠি পড়ছে। স্বামীর। ড্রাইং রুমে বসে।

–আমি অনেক অনেক দূরে চলে যাচ্ছি, শার্ল মারতেইল লিখেছে, আমাদের আর দেখা হবে না। সন্ধান করে লাভ নেই।

চিঠিটা ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেলে দিল হেলেন–শার্ল, তোমাকে আমি ঠিক খুঁজে বের করবই।

.

রোম।

এখন পুলিশ ডিটেকটিভ ম্যাক্স হরনাং লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এয়ারপোর্টে। সার্ডিনিয়ার পুলিশ স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু ব্যর্থ প্রয়াস। প্রাকৃতিক দুর্যোগে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

এয়ারপোর্ট ম্যানেজারকে সে বলল–দেখো, একজনের জীবন-মরণের সমস্যা। সার্ডিনিয়াতে আমাকে এখুনি পৌঁছোতে হবে। বিশ্বাস করো।

–আমি বুঝেছি সিনর। কিন্তু কোনো সাহায্য আপনাকে করতে পারছি না।

ম্যাক্স জানে, ঝড়ের জন্য প্লেন ছাড়ছে না। যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন। সিরোক্কো থামলে তবেই আবার যাতায়াত ব্যবস্থা শুরু হবে।

কখন প্লেন ছাড়বে?

তা কম করে বারো ঘণ্টার অপেক্ষা।

-বারো ঘণ্টা! হয়তো এলিজাবেথকে আর বাঁচানো সম্ভব হবে না।

.

৩৮.

শত্রুরা অন্ধকারকে পছন্দ করে। আঘাত হানার জন্য অদৃশ্য হায়নার মতো অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে।

এলিজাবেথের বুঝতে আর বাকি রইল না, পুলিশ ডিটেকটিভ ব্রুনো ক্যামপানা তাকে খুন করার উদ্দেশ্যেই এখানে এসে উঠেছে।

ও নিশ্চয়ই রিস্-এর দলের লোক।

সুইস ডিটেকটিভ ম্যাক্সের বলা কথাটা মনে পড়ে গেল–কেউ একা জীপ অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটায়নি। সে এমন একজন, যার এই দ্বীপের নাড়ি নক্ষত্র জানা, বাইরে থেকে হত্যাকারীকে সে সাহায্য করেছে।

ক্যামপানা দারুণ কৌশল করেছিল।

আপনার জন্য আমরা চিন্তিত, প্রতিটি নৌকোয় নজর রেখেছি, এয়ারপোর্টে লোক রেখেছি।

রিস্ অভ্রান্তভাবে বুঝতে পেরেছে, লিজা সার্ডিনিয়ার ভিলাতে এসেই উঠবে।

প্রথম থেকেই ক্যামপানা তাকে ভুল বুঝিয়েছে। থানায় না নিয়ে গিয়ে ভিলায় এনে তুলেছে। নিশ্চয়ই ও পুলিশ হেডকোয়াটার্সে ফোন করেনি, ফোন করেছিল রিসূকে। ওকে জানিয়েছে, আমরা ভিলায় পৌঁছে গেছি।

লিজা বুঝতে পারছে, তার এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু শরীরে সে বল পাচ্ছে না। হাত-পা যেন ভারী বোঝা, চোখ মেলতে ইচ্ছে করছে না। নিশ্চয়ই ডিটেকটিভ ব্রুনো কফির সাথে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছে।

সে রান্নাঘরে এল। জলের সাথে ভিনিগার মেশাল। খেয়ে নিল। বমি করল। তবুও স্নায়ুগুলো দুর্বল, তার মস্তিষ্ক ঠিক মতো কাজ করছে না।

সে নিজেই নিজের মনকে বোঝাল-লিজা, তুমি এভাবে মরতে পারো না। তুমি লড়বে। ওরা তোমায় খুন করতে আসছে। রিস, এসো। আমায় খুন করো, এসো।

বাইরে তখন মরু বাতাসের দাপাদাপি। কখনও বাতাসে ভাসছে আর্তনাদ, কখনও বিদ্রূপ, আবার কখনও সাবধান ধ্বনি।

লিজা কি পালিয়ে যাবে? না কি এখানে থাকবে?

লিজা জানে, খুনের ব্যাপারটাকে রিস দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দেবে।

সে তাকাল স্যামুয়েল রফের পোর্টেট্রের দিকে, তার পূর্বপুরুষ।

–এলিজাবেথ, ওকে আটকাও।

কে বলল? স্যামুয়েল?

সম্ভব নয়। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

লিজা চোখ আর খুলে রাখতে পারছে না। ভীষণ ভীষণ ঘুম পাচ্ছে তার।

আমি রিকে জিততে দেব না। এমনভাবে ব্যাপারটাকে আমি সাজাব, সবাই বুঝবে এটা স্রেফ খুন।

ছুঁড়ে মারল টেবিল ল্যাম্প আয়না লক্ষ্য করে।

কোনোটাই গোটা রইল না।

চেয়ারটা ছুঁড়ে দেওয়ালে এমনভাবে মারল, সেটা গেল ভেঙে।

বুককেসের বইগুলো টেনে নামাল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল। কত বইয়ের পাতা ছিঁড়ল। সব ঘরময় ছড়িয়ে গেল। পুলিশ এসব দেখবে, আর সন্দেহ জাগবে

হঠাৎ এক ঝলক হাওয়া ঢুকল। কাগজগুলো জানালার বাইরে উড়ে গেল।

অর্থাৎ?

লিজা এখানে একাকি নয় আর।

.

রোম।

লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি এয়ারপোর্ট। একটা প্লেনকে নামতে দেখে ম্যাক্স ছুটে গেল–

–আমাকে সার্ডিনিয়ায় পৌঁছে দেবে?

ব্যাপার কী বলুন তো? একজনকে এইমাত্র ওখানে পৌঁছে দিয়ে আসছি। ঝড়ের যা দাপট!

–আমায় পৌঁছে দেবে।

–দিতে পারি। চার্জ বেশি লাগবে। তিনগুণ।

ম্যাক্স রাজি। হেলিকপ্টারে উঠে বসল সে।

–পাইলট, একটু আগে তুমি বললে না, একজনকে পৌঁছে দিয়ে এলে সার্ডিনিয়াতে, তার নামটা বলতে পারো?

উইলিয়ামস।

.

এই মুহূর্তে অন্ধকারই এলিজাবেথের উপকারী বন্ধু। সে নিজেকে অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে, আততায়ীকে আড়াল করতে পারছে। লুকোতে হবে। কোথায়? সিঁড়ির মাথায় ছুটে গেল। কী যেন লাফিয়ে উঠল। আর্ত চিৎকার করে উঠল লিজা। না, কেউ

নয়। জানালার বাইরে গাছের ডালে হাওয়া ঝাপটা দিচ্ছে। তারই ছায়া। কিন্তু তার আর্তচিৎকার নিশ্চয়ই। নীচে রিসের কানে চলে গেছে।

রিসকে বাধা দাও। কিন্তু কী ভাবে? তার পূর্বপুরুষ স্যামুয়েল রফ হলে কী করত?

ওপর তলার ঘরের দরজাগুলো সব বন্ধ করে দিল লিজা।

ক্র্যাকোর ইন হুদি বস্তির কাঠের গেট। নিজেকে বাঁচাতে সে রাতের প্রহরী আরামকে খুন করেছে। তারপর পালিয়েছে। কারো হাতে যেন ধরা পড়তে না হয়।

এলিজাবেথ সেই স্যামুয়েলের উত্তরাধিকারী, রক্তে তারই বংশের ধারা-ব্লাডলাইন! সে যেন এই মুহূর্তে স্যামুয়েলে রূপান্তরিত হয়েছে।

ফ্লাশলাইটের আলোকে যেন সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে? কে? নিশ্চয়ই রিস্।

লিজা টাওয়ার রুমে ঢুকে পড়ল। তালা বন্ধ করে দিল। এবার দরজা ভাঙার পালা। পুলিশ দেখবে। সব দেখে শুনে বুদ্ধিমান পুলিশ ডিটেকটিভ ম্যাক্স হরনাং বলবে, এটা মার্ডার, অ্যাক্সিডেন্ট নয়। লিজা দরজায় ব্যারিকেড তৈরি করতে লেগে গেল। টেবিল, চেয়ার, আর্মচেয়ার, তার ওপরে আবার টেবিল–সব দরজার সঙ্গে সাঁটিয়ে দিল।

দরজা ভাঙার শব্দনীচের তলায়। ফ্রেঞ্চ ডোরের বাইরে পাগলা হাওয়ার শোকার্ত আর্তনাদ। নিশ্চয়ই কোথাও কোনো গোলমাল হয়েছে। রিস্ দরজা ভাঙছে? সাহস তো

বড়ো কম নয়। এখানে এমন কিছু নেই, যা দিয়ে নিজেকে বাঁচাবে। অস্ত্রও নেই। অতএব অন্ধকারই ভরসা।

কিন্তু রিস্ এত দেরি করছে কেন? এখনও আসছে না কেন? যদি মৃতদেহ রিস্ অন্যত্র না সরায়, পুলিশ তো দেখবে, ফার্নিচার, আয়না, দরজা সব ভাঙা। পুলিশের নিশ্চয়ই সন্দেহ হবে। তাই তো?

যদি রিসের জায়গায় সে নিজে হত তাহলে? পুলিশ সন্দেহ করবে না, অথচ

হ্যাঁ, উপায় একটা আছে, ব্যাপারটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে তার নাকে ধোঁয়ার গন্ধ ভেসে-এল।

.

৩৯.

হেলিকপ্টারে তখন ম্যাক্স হরনাং। সার্ডিনিয়ার উপকূলে চোখে পড়ল। লাল আভা। ধুলোর ঘূর্ণি। মোটর ব্লেডের বিকট গর্জন। তাকে ছাপিয়ে শোনা গেল পাইলটের চিৎকার।

ঝড়ের অবস্থা আরও খারাপ। হেলিকপ্টার নামানো যাবে কিনা সন্দেহ।

নামতেই হবে। পোরটো সালভোর দিকে চলো।

–পাহাড় চুড়োর ওপর।

–হ্যাঁ। কেন, পারবে না?

–সম্ভাবনা শতকরা সত্তর বনাম তিরিশ।

–বেশি কোন্ দিকে?

–আমাদের বিপক্ষে।

.

ধোঁয়া বের হচ্ছে, দরজার নীচ থেকে। বাইরে ঝড়ের গর্জনের সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছে আগুনের নৃত্য। সব বুঝেছে এলিজাবেথ, তবে দেরিতে। সে এই ঘরে বন্দি। দরজা জানালা আসবাব ভেঙে আর কী লাভ! সবই তো আগুনের গর্ভে যাবে! এমিল জেপলি ও তার ল্যাবোরেটরি যে ভাবে আগুনে পুড়ে গিয়েছিল, এলিজাবেথেরও সেই হাল হবে। রিসকে দোষারোপ করা যাবে না। সে বলবে, ওই সময় অন্য কোথাও ছিল। এলিজাবেথ হেরে যাচ্ছে। রিসেরই জয় হবে।

ঘরের ভেতরে ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকাচ্ছে। হলুদ ও দুর্গন্ধ যুক্ত ধোঁয়া। দম বেরিয়ে যাচ্ছে। যেন। আগুন স্পর্শ করল দরজার কাঠ।

সে ব্যালকনিতে এল। বুক ভরে টাটকা বাতাস নিল। বিল্ডিং-এর এক পাশে মহাশূন্যে দ্বীপের মতো ছোট্ট এই ব্যালকনি। এখান থেকে পালাবে কী করে?

যদি

ঝট করে সে ঘরে ঢুকে গেল। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে এল। উঠে দাঁড়াল। ছাদটা ধরতে হবে। ব্যাপারটা বিপজ্জনক–চেষ্টা করছে সে ।

ততক্ষণে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়েছে পর্দা, বই, কার্পেট, আসবাব-এ।

শ্লেটের ছাদ। অবশেষে হাত ঠেকাতে পারল সে। নিজেকে টেনে তুলল সে ছাদের ওপরে। ঠিক যেন, ইহুদি বস্তির দেওয়াল টপকাচ্ছে স্যামুয়েল, নিজের প্রাণ রক্ষা করার তাগিদে। লিজা একটু একটু করে ওপরে উঠছে। শ্লেটের ছাদ। একটু হাত স্লিপ করলে আর বাঁচার কোনো পথ নেই, নীচে অতল আঁধার। ।

সে তাকাল ব্যালকনির দিকে। আগুন সেখানেও ছুটে এসেছে।

অতিথিদের একটা ব্যালকনি তখনও আগুনের ছোঁয়া পায়নি। সেখানে যেতে পারবে কি লিজা? ঢালু ছাদ, আলগা শ্লেট, তার ওপর প্রচণ্ড ঝড়। পা ফসকে গেলে মৃত্যু অনিবার্য।

ঠিক এই সময় অশরীরির মতো আবির্ভূত হল স্যার অ্যালেক নিকলস।

সে চিৎকার করে বলল–ওল্ড গার্ল, খুব সাবধানে! নামো, ধীরে ধীরে পা ফেলল। খুব সাবধান!

লিজা যেন বুকে বল ফিরে পেল। সে একটা একটা শ্লেট ধরে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। অ্যালেক তাকে ভরসা দিচ্ছে।

হঠাৎ একটা শ্লেট আলগা হয়ে গেল।

ধরো! অ্যালেক চেঁচিয়ে উঠল।

লিজা ছাদের প্রান্তভাগে চলে এসেছে। নীচে ব্যালকনি, তাকে এখন লাফাতে হবে। যদি পা ফসকায়...।

নীচের দিকে তাকাবে না। অ্যালেকের সাবধান বাণী। চোখ বুজে লাফ দাও। আমি তোমাকে ধরে নেব।

লিজা শূন্যে লাফ দিল। হাত বাড়িয়ে অ্যালেক তাকে ধরে নিল।

ওঃ কী শান্তি! লিজা চোখ বুজল।

–ওয়েলডান। অ্যালেক বলল।

পরক্ষণেই পিস্তলের নল লিজার রগের ওপর ধরল।

.

৪০.

ঝড়ের তাণ্ডবকে উপেক্ষা করে হেলিকপ্টার গাছের মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে। দূরে পোরটো সালভোর পাহাড়ের চূড়া।

–ওই তো ভিলা দেখা যাচ্ছে! পরক্ষণেই ম্যাক্স আঁতকে উঠল, ভিলা আগুনে পুড়ছে!

.

ঝড়ের আওয়াজ ছাপিয়ে হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পেল এলিজাবেথ। কিন্তু অ্যালেকের কানে যায়নি। তার যন্ত্রণাকীর্ণ দুটি চোখ তখনও এলিজাবেথের দিকে নিবদ্ধ।

–এসবের জন্য ভিভিয়ানই দায়ী। অ্যালেক অনুযোগের সুরে বলল, ওর চাপে পড়েই আমাকে এসব করতে হচ্ছে। ওরা যেন আগুনের মধ্যে তোমার লাশ দেখতে পায়। আমার কথা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো।

অ্যালেকের কথা লিজার কানে ঢুকছে না। সে তখন রিসের কথা ভাবছে। তাহলে রিস্ নয়, অ্যালেকই খুনি। তার বাবার হত্যকারী, দুবার তাকে খুন করার চেষ্টা চালিয়েছিল।

গোপন রিপোর্ট চুরি করে রিসের ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রেখেছিল।

হেলিকপ্টার এখন গাছের আড়ালে।

–এলিজাবেথ চোখ বন্ধ করো। অ্যালেকের আদেশ।

না।

হঠাৎ রিস উইলিয়ামসের কথা শোনা গেল–অ্যালেক, পিস্তল নামাও।

নীচে লনের ওপরে আগুনের আভায় দেখা গেল রিস্ উইলিয়ামস, চিফ অফ পুলিশ লুইজি ফেরারো, ছজন পুলিশ অফিসার, প্রত্যেকের হাতে রাইফেল।

রিস্ আবার চেঁচিয়ে উঠল–অ্যালেক, তোমার খেল খতম। ওকে ছেড়ে দাও।

ডিটেকটিভের হাতে টেলিস্কোপিক রাইফেল–এখন গুলি চালালেই মিসেস উইলিয়ামসের বিপদ হতে পারে।

–সার যাও! রিস্ বিড় বিড় করে প্রার্থনা করছিল।

এইসময় ম্যাক্স হরনাং ছুটে এল। ওপরের ব্যালকনির দিকে তাকাল। ওদের দুজনকে দেখে থমকে দাঁড়াল। রিস্ বলল–ম্যাক্স, দেরিতে হলেও তোমার পাঠানো খবর আমি পেয়েছিলাম।

প্রচণ্ড ঝড়ে আগুনের শিখা নেচে নেচে উঠছে। সব পুড়ছে, ঠিক যেন ইনফারনোর পাহাড়! বীভৎস জ্বলন্ত নরক!

লিজা তাকাল অ্যালেকের মুখের দিকে। বন্ধুবেশি শয়তান। স্থির জ্বলন্ত দুটি চোখ।

অ্যালেক ব্যালকনির দিকে সরে গেল।

টেলিস্কোপক রাইফেল এই ক্ষণটির প্রতীক্ষায় ছিল। দেখা গেল টলমল করতে করতে অ্যালেক জ্বলন্ত বাড়ির ভেতর ঢুকছে।

ছুটে এসেছে রিস্। সে পাঁজাকোলা করে লিজাকে তুলে নিয়ে এল। নীচে লনের ওপর শুইয়ে দিল।

রিস বলল–তোমায় আমি ভালোবাসি, ডার্লিং।

তার চোখে ভালোবাসা ও যন্ত্রণার ছবি।

লিজা যেন বোবা বনে গেছে। এ সে কী ভুল করতে চলেছিল! এই ভালো মানুষটাকে সে খুনি বলে সন্দেহ করেছিল? ওঃ ভগবান, লিজা আজীবন এর শোধ দেবে। কিন্তু এখন তার দেহ অবসন্ন। কিছু ভাবতে চাইছে না মন। একবারের জন্য লিজার মনে হল, যেন অন্য কোথাও অন্য কারো ভাগ্যে এসব ঘটনা ঘটেছে।

রিসের বলিষ্ঠ দুটি হাতে লিজা আবদ্ধ। এটাই তো আকাঙ্ক্ষিত শান্তি! তবে আর কী চাই?

.

অবশেষে

এ যেন নরকের জ্বলন্ত একটা কোণ! ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেছে। আগুনের লেলিহান শিখা স্পর্শ করল স্যার অ্যালেক নিকলসের মাথার চুল। তার মনে হল, এ অগ্নি শিখার হুংকার নয়, ভিভিয়ান গান গাইছে, তাকে কাছে ডাকছে।

হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে তার দৃষ্টি গেল বিছানায়, ভিভিয়ান সেখানে শুয়ে আছে, নগ্ন, গলায় লাল রঙের ফিতে, ঠিক যেন সোহাগের প্রথম রজনী।

ভিভিয়ান বলছে–অ্যালেক, আমি তোমাকে সত্যিই ভালোবাসি।

অ্যালেক অবিশ্বাস করতে পারে না। অনেক পুরুষের সঙ্গে ভিভিয়ান অনেক কিছু করেছে। তার জন্য সে শাস্তি পেয়েছে। তবে সরাসরি নয়। অ্যালেক বদলা নিয়েছে অন্য মেয়েকে ওপর। পর্নো ফিল্মের অভিনেত্রীদের ওপর, ভিভিয়ানের পাপের ফল ওরা ভোগ করে। আরও কত ভয়ংকর কাজ করেছে অ্যালেক।

ভিভিয়ান বলছে–অ্যালেক, তুমিই আমার একমাত্র ভালোবাসা।

অ্যালেক একথা জানে।

উলঙ্গ ভিভিয়ান এখন অ্যালেককে নিজের দিকে আকর্ষণ করছে। তারা পরস্পরে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েছে। অ্যালেকের পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করেছে ভিভিয়ানের গোপন গভীর ভিভিয়ান যৌনতৃপ্তি লাভ করেছে এবং অনাবিল আনন্দ। ঠিক যেন যন্ত্রণাময়। ভিভিয়ারে শরীরের উত্তাপে অ্যালেক পুড়ছে। ভিভিয়ানের গলায় বাঁধা লাল রিবন, আগুনের জির

হয়ে তাকে চুম্বন দিচ্ছে। ঠিক সেই ক্ষণে একটা জ্বলন্ত বিম এসে পড়ল অ্যালেকের ওপর জীবন্ত পুড়ছে সে।

আবেশ ও উন্মাদনার চরম মুহূর্তে অন্যদের মতো অ্যালেকেরও মৃত্যু হল।